প্রীতিলতার আত্মকথা

প্রীতিলতার আত্মকথা

সম্পাদনা

শেখ রফিক

বিপ্লবীদের কথা

cÖxZjZvi AvZ¥K_v 2

প্রীতিলতার আত্মকথা

প্রকাশক
বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা
২ কমরেড মণি সিংহ সড়ক, মুক্তিভবন নিচতলা
(কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়) পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
সেল: ০১৭২৬-১২৩৫৫০, rafiqcpb@gmail.com

স্বত্ব
বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা

প্রকাশকাল
পঞ্চম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০২০

প্রচ্ছদ
মেহেদী বানু মিতা

মেকআপ
বিপ্লবীদের কথা

বর্ণ বিন্যাস ও বানান শুদ্ধিকরণ
বিপ্লবীদের কথা

ছেপেছেন
মাটি ও মানুষ, ১১০ আলিজা টাওয়ার, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

বাঁধাই
রবিন অ্যান্ড ছোঁয়া বুক বাউন্ডিং, ২৪৫/এ ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

ওঝইঘ:৯৭৮-৯৮৪-৯০৭৮৮-০-৭

মূল্য: ১৫০ টাকা

অনলাইনে পেতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/biplobiderkotha

উৎসর্গ

লাকী আক্তারসহ গণজাগরণমঞ্চের বীরকন্যাদের

চট্টগ্রাম ইউরোপিয়ান ক্লাবে বাইরের সাইনবোর্ডে লেখা ছিল–
কুকুর ও ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ ।
ইংরেজদের এরকম মনোভাব বিপ্লবীদের কাছে ছিল অসহ্য ।

ভারত উপমহাদেশের অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা থেকেই অনেক নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি বিপ্লবী দলের সঙ্গে ঘরে ঘরে মা, বোন, মাসিমা, কাকিমা, দিদি, বৌদিরা যুক্ত ছিলেন। যেমন ছিলেন অগ্নিযুগের প্রথম পর্বে স্বর্ণ কুমারী দেবী, সরলা দেবী, আশালতা সেন, সরোজিনী নাইডু, ননী বালা, দুকড়ি বালা, পরবর্তীকালে ইন্দুমতি দেবী, (অনন্ত সিংহের দিদি) লীলা রায়, পটিয়া ধলঘাটের সাবিত্রী দেবী প্রমুখ দেশপ্রেমিক নারী। তারই ধারাবাহিকতায় সেই অগ্নিযুগের অগ্নিকন্যা, বীরকন্যা প্রীতিলতার আবির্ভাব।

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

“দেশের মুক্তি সংগ্রামে নারী ও পুরুষের পার্থক্য আমাকে ব্যথিত করিয়াছিল। যদি আমাদের ভাইয়েরা মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারে, আমরা

ভগিনীরা কেন উহা পারিব না?

...মাতৃভূমির মুক্তির জন্য যে কোনো দুরূহ বা ভয়াবহ ব্যাপারে ভাইদের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিতে তাহারা ইচ্ছুক– ইহা প্রমাণ করিবার জন্যই আজিকার এই বিপদসঙ্কুল অভিযানের (ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ) নেতৃত্ব আমি গ্রহণ করিতেছি।”Ñপ্রীতিলতা

অদম্য উদ্যম আর প্রচণ্ড সাহস বুকে ধারণ করে দেশমাতৃকা ভারতের স্বাধীনতার জন্য সেই অগ্নিযুগে কিছু মুক্তি-পাগল মানুষ ‘জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য’ করে এগিয়ে এসেছিলেন। তাদের সঙ্গে সেদিন সামিল হয়েছিলেন বীর চট্টলার বীরকন্যা প্রীতিলতা। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য যে সশস্ত্র বিপ্লববাদী লড়াই-সংগ্রাম সংগঠিত হয় এবং যার ধারাবাহিকতায় ভারতমাতা স্বাধীন হয়, সেই ইতিহাসে যে সকল বিপ্লবী রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রীতিলতা অন্যতম।

অগ্নিযুগের অগ্নিজিতা বিপ্লবী প্রীতিলতাকে তরুণপ্রজন্মের কাছে নিয়ে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করেই 'প্রীতিলতার আত্মকথা' বইটি সম্পাদনা করা হয়েছে।

সতর্কতা সত্ত্বেও এই বইতে মুদ্রণজনিত ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়, তার জন্য মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। সচেতন পাঠক কোনো ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে।

শেখ রফিক
ফেব্রুয়ারি ২০২০
ইকুরিয়া, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

আমি প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ।

'রাণী' আমার ছোট বেলার নাম ।

চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল অফিসের হেড কেরানি জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দেদার আমার বাবা, মা প্রতিভা ওয়াদ্দেদার । মা-বাবা আদর করে আমার নাম রেখেছিলেন 'রাণী' ।

আমার বড় একভাই– 'মধু' অর্থাৎ মধূসূদন ওয়াদ্দেদার । আমি মা-বাবার দ্বিতীয় সন্তান । একটু বড় হতেই শুনেছি, আমার আগমনে পরিবারের অনেকেই খুশি নন, বিশেষত স্ত্রী লোকেরা । এর বিশেষ কারণ, তখনকার সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের স্থান ছিল গৌণ, পুরুষের করুণা-নির্ভর ।

মা-বাবার দ্বিতীয় সন্তান শুধু কন্যা নই আমি, জন্মেই আর একটি অপরাধ সাথে নিয়ে এসেছি, তা আমার গায়ের 'কালো রঙ' । তাই পড়শী-আত্মীয়রাও দুঃখ করেন, খেদোক্তি করেন যখন তখন । কালো মেয়ে যত ভালোই হোক আমাদের বাঙালি পরিবারের জন্য এক দুর্ভাগ্য ।

বাবা আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেন, একেবারে তৃতীয় শ্রেণীতে । ড. খাস্তগীর উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় তখনকার সময়ে উন্নত মানের শিক্ষালয় । শ্রেণী পরীক্ষায় বেশ ভালো করছি । স্থান আমার প্রথম অথবা দ্বিতীয় । আমার প্রতিযোগিনী 'কুমুদিনী' নামের একটি মেয়ে ।

১৯২৪ সালের কথা । আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী । একদিন বিকেল বেলা বাড়ি ঢুকে বড়দা এক উত্তেজনা পূর্ণ সংবাদ পরিবেশন করলেন । রেল কারখানার শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন দেয়ার জন্য সতের হাজার টাকা ঘোড়ার গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল । গাড়িতে বন্দুকধারী পুলিশও ছিল দু'জন । বেলা তখন সাড়ে এগারটা । টাইগার পাস এলাকার ছোট রাস্তা । ঘোড়ার গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল পিস্তলধারী চারজন ডাকাত । প্রাণ ভয়ে গাড়ির চালক গাড়ি থামিয়ে দেয় । ডাকাতরা লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে বন্দুকধারী পুলিশকে

নিরস্ত্র করে টাকার থলে কেড়ে নেয়। তারপর ডাকাতরা পিস্তলের ভয় দেখিয়ে পুলিশ ও কোচোয়ানকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়।

wKQ w`b ci...

সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলছে। আমি ছোট বোনদের নিয়ে পড়তে বসেছি। বড়দা ঘরে ঢুকলেন। ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, জানিস রাণী, শহরের দেয়ালে দেয়ালে বড় বড় অক্ষরে বড় বড় পোস্টার লাগিয়েছে। রেলের টাকা ডাকাতির ডাকাতদের ধরে দিতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার। ডাকাতদের সন্ধান দিলে বা ধরতে সাহায্য করলেও পুরস্কার পাওয়া যাবে। জানিস, দশ হাজার টাকা– অনেক টাকা।

মাসাধিক পরে শহরে হৈ চৈ পড়ে গেল। ২ জন ডাকাত ধরা পড়েছে, ভয়ঙ্কর ডাকাত। ডাকাত দু'জনের একজন চট্টগ্রাম শহরস্থ উমাতারা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সূর্য সেন। অন্য জন অম্বিকা চক্রবর্তী, পোর্ট অফিসের কেরানি।

পুলিশ ও দুজনকেই পাহারা দিচ্ছে। রেনুর ভাই অনিলদা চাপা উত্তেজনায় বললেন– ওই তো আমাদের মাস্টার মশায়! মাস্টার মশায়কে অমন করে নিয়ে আসছে কেন! গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে পাহারারত পুলিশ প্রচ- বেগে লাথি মারে লোক দু'জনকে। বুটপরা পায়ের লাথিতে ওঁদের দেহ বেঁকে যায়, ঝুঁকে পড়ে। মুখে ফোটে তীব্র যন্ত্রণার ছাপ। আমি অসীম এক যন্ত্রণায় 'আহ্' শব্দ উচ্চারণ করি। দেহের ভারসাম্য রক্ষা করি রেনুর কাঁধে হাত রেখে। আমি কাতর কণ্ঠে বলি, এঁরা তো ডাকাত নন, পুলিশ অমন নিষ্ঠুরভাবে ওঁদের মারছে কেন!

উষাদি হেসে বললেন দোষ করেছে, মানে ডাকাতি করেছে। অপরাধ করেছে এই কথা তো? কিন্তু দোষ কার? কে শাস্তি দিবে? সেই বিচার কে করবে? এই যে আমাদের স্বদেশ, এখানে আমরা কিভাবে আছি, কেন আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ না খেয়ে থাকে, শিক্ষা পায় না, রোগে ঔষধ পায় না, অবাক হয়ে তার কথা শুনছিলাম। ওই দিন উষাদি আমাকে একখানা বই 'ঝাঁসির রাণী লক্ষীবাই' দিয়ে বলেছিলেন এটা ভালো করে পড়। এটা পড়া শেষ হলে আরো বই পড়তে দেব। উষাদি ছিলেন স্বদেশিদের গোপন সহযোগী।

বাড়িতে ফিরে পরের দিন সন্ধ্যাবেলা ওই বইখানি পড়তে শুরু করলাম। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে বইটি পড়ে শেষ করলাম। খুড়তুত ভাই ও উষাদি'র সংস্পর্শে এসে আমি রাজনীতির অনেক কিছু বুঝতে শিখলাম।

'কোনো কোনো সময় আমরা স্বপ্ন দেখতাম বড় বিজ্ঞানী হব। সেই সময়ে

ঝাঁসীর রাণী আমাদের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে। নিজেদেরকে আমরা অকুতোভয় বিপ্লবী হিসেবে দেখা শুরু করলাম’। (স্কুলে রাণীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন ছিলেন কল্পনা দত্ত (পরবর্তীতে বিপ্লবী)। এক ক্লাসের বড় রাণী কল্পনার সাথে ব্যাডমিন্টন খেলতেন। তাদের স্বপ্নের কথা লিখেছেন কল্পনা দত্ত।)

(১৯২৪ সালের কথা। দিনটির কথা কারো মনে নেই। খুব সম্ভবত জুলাই-আগস্ট মাসের কোনো একদিন। ভ্যাপসা গরম। আকাশে মেঘ জমেছে। যেকোনো সময় বৃষ্টি আসতে পারে। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে ভাই-বোনরা সবাই মিলে পড়তে বসেছে। রাণী তখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। সবাই পড়ছে। শুধু থেমে আছে মধুসূদন। মধুসূদন প্রীতিলতার বড়দা। বড়দা’র পড়া না শুনতে পেয়ে তার দিকে তাকালো প্রীতিলতা। বড়দা মধুসূদন বোনের মুখের দিক তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলো– আজ রেল শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন দেয়ার জন্য বিপুল অংকের টাকা ব্রিটিশ কর্মচারীরা ঘোড়ার গাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছিল। ওই গাড়িতে দু’জন পুলিশও ছিল। কিন্তু হঠাৎ দিনের বেলায় বড় রাস্তার ধারে চারজন লোক পিস্তল হাতে সামনে দাঁড়িয়ে গাড়ি থামালো। তারা গাড়ি থেকে সবাইকে নামিয়ে দিয়ে টাকাসহ গাড়ি নিয়ে চম্পট।

পরে জানা গেল ওই লোকগুলো ডাকাত নয়, স্বদেশি। স্বদেশি আন্দোলনের কর্মী। তারা দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করছে। তারা মৃত্যুকে পরোয়া করে না। এই দুর্ধর্ষ ডাকাতির কথা সেদিন প্রীতিলতাকে দারুণভাবে আলোড়িত করে। এক মাস পর, একদিন সেই রেলওয়ে ডাকাতির লোকদের আস্তানায় পুলিশ হামলা চালায়। উভয় দলের সাথে শুরু হয় সংঘর্ষ। দীর্ঘ সময় ধরে চলে বন্দুক যুদ্ধ। অবশেষে শোনা গেল সেই ডাকাত দলের দুজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। আহত দুজনের একজন হলো উমাতারা ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক সূর্য সেন। অন্যজন পোস্ট অফিসের কেরানি অম্বিকা চক্রবর্তী।

গরুর গাড়িতে করে তাদের নিয়ে রহমতগঞ্জের রাস্তা দিয়ে জে. এম. সেন হলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন রাণী তার এক সহপাঠিনীর বাসায় বসে জানালার ফাঁক দিয়ে তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখেছিল। সহপাঠিনীর যে ভাইটি উমাতারা স্কুলে পড়ে, সে বলে উঠলো ওই-তো আমাদের মাস্টারমশাই, চাদর গায়ে বসে আছে। উনি আমাদের অংকের মাস্টার।

একথা শুনে সবাই অবাক হলো। তারা দু’জন ছিল গুলিবিদ্ধ অবস্থায়। তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার সময়ও পুলিশ লাথি, চড় মারছিল। ক্লান্ত অবস্থায় দু’জনই গাড়ির মধ্যে বার বার ঢুলে পড়ছিল। এই দৃশ্য দেখে রাণী খুব কষ্ট পেল। তাদের জন্য তার মায়া হলো। কিন্তু কি করার আছে তার! বাসায় গিয়ে মা-বাবাকে এই ঘটনা বলল। তারাও রাণীর পূর্বেই এই ঘটনাটি শুনেছিলেন। রাণী মা-বাবাকে বলেছিল চল আমরা মাস্টারমশাইকে দেখে আসি। বাবা সরকারি চাকরি করার কারণে রাণীর অনুরোধ রাখতে পারলো না। এক বুক কষ্ট নিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়া আর কোনো কিছুই করার ছিল না রাণীর!

কিছুদিন পর শোনা গেল, কলকাতা থেকে বিখ্যাত ব্যারিস্টার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত– সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর পক্ষ সমর্থন করে চট্টগ্রাম এসেছেন। কোর্টে এই মামলা দেখার জন্য অনেক লোকের ভিড় জমে। সূর্য সেনের অনেক প্রিয় ছাত্রও এই মামলা দেখার জন্য কোর্টে আসে। রাণীর এক খুড়তুত ভাই রোজ এই মামলা দেখতে যেত। সে ছিল চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র। তখন তিনি দশম শ্রেণির ছাত্র। খেতে খেতে ভাইটি সেই মামলার কাহিনী বলল। রাণী বলল দাদা, তারা কবে ছাড়া পাবে? তাদের গায়ে নাকি গুলি লেগেছিল, কেমন আছে?

ভাইটি বলল দেখলাম-তো ভালোই আছে। রাণীর মা বলল ডাকাতদের না ধরে ভালো মানুষকে ওরা মামলা দিয়েছে। রাণী দেখিস তারা একদিন ছাড়া পেয়ে যাবে। মায়ের কথা শুনে রাণীর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রাণীর মা প্রতিভাদেবী ওই ছেলেটিকে মনু বলে ডাকত। তিনি বললেন মনু তারা যেদিন ছাড়া পাবে সেদিন বাসায় এসে আমাদের খবরটা জানিয়ে যেও। কিছুদিন পর তারা দু'জন বেকসুর খালাস পেল।

রাণীর স্কুলের শিক্ষিকা উষাদি একদিন অন্যান্য মেয়েদের সাথে গল্প করার জন্য রাণীকে ডেকে নিয়ে যায়। দেশ-বিদেশের গল্প শুনায়। ওই দিন তিনিই তার ছাত্রীদেরকে সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর মামলার কথা বলছিলেন। রাণী সবার আগে বলে উঠল তাদের ছাড়া পাওয়ার কথা মা কয়েক দিন আগে বলেছিলেন।)

আমি প্রতিজ্ঞা করে বলি, দাদা আমি এই বইগুলো লুকিয়ে রাখবো মা-বাবাকে দেখাবো না। আমি তখন থেকেই চিন্তা করতে থাকি এর মধ্যে এমন কি বই আছে যা কেউ দেখলে অনেক ক্ষতি হবে? দ্বিধা-সংকোচ-ভয় কাটিয়ে একদিন ভাবলাম দাদা বইগুলো অন্যদের দেখাতে নিষেধ করেছে কিন্তু আমাকে দেখতে বা পড়তে নিষেধ করেনি। তাই একদিন রাতে বাসার সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন ওই কাগজে মুড়ানো বইয়ের প্যাকেটটি খুলে দেখলাম 'ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, কানাইলাল, দেশের কথা, ও সরকারি রাউলাট কমিশন' ইত্যাদি বই। 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স'সহ আরো কিছু কাগজ-পত্র। মাসখানেকের মধ্যে এই বইগুলো পড়ে প্রায় শেষ করে ফেললাম।

(ওই বছর ভারত উপমহাদেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। সর্বত্র সংগঠিত হচ্ছে সশস্ত্র বিপ্লববাদী সংগঠন। চট্টগ্রামে রেলওয়ে ডাকাতি, বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক ডাকাতি ও বিপ্লববাদীদের সশস্ত্র কার্যকলাপের কারণে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে ব্রিটিশ 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স' নামে এক জরুরি আইন পাশ করে। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল– 'রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য সন্দেহভাজনদের বিনা বিচারে আটক রাখা'। এই আইন পাশ হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের গ্রেপ্তার করা শুরু করে। চট্টগ্রাম থেকে সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তীসহ অনেককেই এই আইনে আটক করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে রাণী বহুবার বিপ্লবী সূর্য সেনের কথা শুনেছেন।

একবার পুলিশ সূর্য সেনকে ধরার জন্য দেওয়ান বাজারে তার এক আত্মীয় বাড়ি

ঘেরাও করে। সূর্য সেন পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে চট্টগ্রাম কলেজের মেধাবী ছাত্রের বাসায় উঠেন। এই মেধাবী ছাত্রটি শহরের ছাত্র-যুব বিপ্লবীচক্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। রাণীর খুড়তুত ভাই। এই তরুণ বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনের পলাতক জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করলেন। চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের যেসব গোপন বই-পত্র ছিল তা রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল এই তরুণ যুবকটির উপর। 'ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, কানাইলাল, দেশের কথা ও সরকারি রাউলাট কমিশন' ইত্যাদি বই।

'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স'-এ নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীরা ধরা পড়ার পর ওই ছেলেটি এই বইগুলো কাগজে মুড়িয়ে রাণীর কাছে রাখে। রাণীকে এই বইগুলো কাউকে দেখাতে নিষেধ করে দেয় এবং বলে এগুলো দেখালে অনেক বড় ক্ষতি হবে।)

২ মাস পর

রাণী একি করছিস? দাদা ভয় নেই, আমি কাউকে এই বই দেখাইনি। শুধু গোপনে গোপনে আমি পড়েছি।

(একদিন রাণীর ভাইটি তাদের বাসায় আসলো। তখন বিকেল বেলা। সন্ধ্যা হতে হয়তো বড়জোর আধঘণ্টা বাকী। রাণী বাড়ির পাশে আম গাছের নিচে বসে বাঘা যতীন বইটি পড়ছিল। ঘরে রাণীকে না পেয়ে সে বাড়ির পাশে আম গাছের নিচে চলে গেল। সে আগে থেকেই জানতো রাণী মাঝে মাঝে এই সময়টাতে ওইখানে গিয়ে বই পড়ে। চুপিচুপি রাণীর পাশে গিয়ে সে দেখে বাঘা যতীন বইটি পড়ছে। প্রথমে কিছুটা ভয় পেয়ে গেল পূর্ণেন্দু দস্তিদার [রাণীর খুড়তুত ভাই, চট্টগ্রাম কলেজের মেধাবী ছাত্র, ছাত্র-যুব বিপ্লবীচক্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক])

রাণী ছবিটি উঠিয়ে দাদাকে দেখিয়ে বলে, নিশ্চয়ই তুমি এই ছবিটি চেন? 'ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই'। এই বইটি অনেক আগে পড়ে শেষ করেছি। আমিও সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঝাঁসির রাণী, রাণী ভবানীর মতো দেশের জন্য লড়বো। প্রয়োজনে এদের মতো জীবন উৎসর্গ করবো। তোমাদের সাথে যুক্ত হব। তাছাড়া তোমরা আমায় 'রাণী' বলে ডাক। নাটোরের আর ঝাঁসির রাণী যা পেরেছিল, চাঁটগার রাণী নিশ্চয়ই তা পারবে।

(সন্ধ্যা নেমে আসতে আসতে দু'জন ঘরে চলে গেল। পূর্ণেন্দু দস্তিদার টেবিলের পাশে বসে রাণীর ইতিহাসের বইটি উল্টাচ্ছিল। হঠাৎ বইয়ের পৃষ্ঠার মধ্য থেকে একটি ছবি পড়ে গেল। রাণী ছবিটি উঠিয়ে দাদাকে দেখিয়ে উক্ত কথা বলেছিলেন। দাদা অবাক হয়ে তার কথা শুনে গেল। কিছুই বলল না। কারণ দলের অনুমতি নেই। পরে কোনো একদিন পূর্ণেন্দু দস্তিদার এই কথাগুলো দলনেতা সূর্য সেনকে বলেছিল। মূলতঃ এই বইগুলো পড়ার পর রাণী মনে মনে বিপ্লবী হয়ে উঠতে শুরু করেন। দেশের মুক্তির জন্য অগ্নিশপথ নেন। রাণী থেকে বিপ্লবী প্রীতিলতার বিপ্লব জীবনের সূত্রপাত হয় তখন থেকে।)

১৯২৭ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করার পর ভর্তি হলাম ঢাকায় ইডেন কলেজে। উঠলাম কলেজের ছাত্রীনিবাসে। তখন বিপ্লবী লীলা নাগের সংস্পর্শে আসি। বিপ্লবী লীলা নাগের নেতৃত্বে 'দীপালী সংঘ' সংগঠনটি পরিচালিত হত। দীপালী সংঘ ছিল 'শ্রী সংঘ'-এর মহিলা শাখা সংগঠন। 'শ্রী সংঘ' ছিল তখনকার ঢাকার একটি বিপ্লবী দল।

একদিন লীলা নাগের সাথে দীপালী সংঘ নিয়ে কথা হলো। তিনি আমাকে দীপালী সংঘের সদস্য হওয়ার জন্য একটি ফর্ম দিয়ে বললেন, তুমি এর উদ্দেশ্য ও আদর্শের সাথে একমত পোষণ করলে বাড়ি থেকে এসে ফর্মটি পূরণ করে দিও।

বাড়িতে আসার পরের দিন ওই ফর্মটি খুড়তুত ভাইকে দেখালাম এবং বললাম দাদা আমি এই সংঘের সাথে কাজ করবো। তোমরা তো আর আমাকে তোমাদের দলে নিবে না, তাই! এখানে যুক্ত হয়ে আমি দেশের জন্য কাজ করবো।

(ভাই পূর্ণেন্দু দস্তিদার ওই ফর্মটি প্রীতিলতার কাছ থেকে নিয়ে গেল আর বলল দলনেতাকে দেখিয়ে তোমাকে ফেরত দিব।

১৯২৯ সাল। তখন সূর্য সেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক। পূর্ণেন্দু দস্তিদার পরের দিন বিকেল বেলা বিপ্লবীদের গোপন বৈঠকে উপস্থিত হলো। বৈঠক শেষে জেলা কংগ্রেসের কার্যালয়ে তিনি মাস্টারদা সূর্য সেনকে ওই ফর্মটি দেখালেন এবং প্রীতিলতার মনের কথাগুলো বললেন। মাস্টারদা সূর্য সেন সবকিছু শুনে পূর্ণেন্দু দস্তিদারকে বললেন, আজ থেকে আমরা প্রীতিলতাকে আমাদের দলের সদস্য করে নিলাম। কিন্তু এই কথা আপাতত আমরা তিনজন ছাড়া অন্য কাউকে জানানো যাবে না। প্রীতিলতাকে একদিন আমার কাছে নিয়ে এসো।)

'আমরা মেয়েরা কি তোমাদের মতো হতে পারি না, দাদা?'

(নিজেকে বোন পরিচয় দিয়ে জেলের ভেতর অসংখ্যবার রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করেন প্রীতিলতা। তার মুখেই শোনেন সূর্য সেনের দৃঢ়চরিত্র ও বীরত্বের কথা। দাদা রামকৃষ্ণের কাছেও প্রীতি একই প্রশ্ন করেছিলেন।)

বিপ্লবীদের জনৈক সহযাত্রী যখন আমাকে দেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করার অপরাধে ব্রিটিশ আইনে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে বললেন, তখন আমি এক নতুন প্রেরণার শিহরণ বোধ করলাম। আমি তার

এক সম্পর্কিত বোন হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়ে কোনোমতে এই হাস্যময় তরুণ বীরের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি জোগাড় করি। তার ফাঁসির আগে তার সঙ্গে আমার প্রায় চল্লিশ বার দেখা হয়েছে। তার সুসংযত দৃষ্টি, ভগবানে অগাধ বিশ্বাস, শিশুসুলভ সারল্য, আবেগপূর্ণ অন্তর, গভীর জ্ঞান ও বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাস আমাকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। আমি আগের চেয়ে আরও দশগুণ বেশি শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা তার কাছ থেকে পাই। আমার জীবনাদর্শকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে মৃত্যুপথযাত্রী ঐ দেশপ্রেমিকের সাহচর্য আমাকে খুব সাহায্য করেছে। রামকৃষ্ণের ফাঁসির পরই কোনো বাস্তব বিপ্লবী কাজে যোগ দেবার জন্য আমার মনে বিশেষ আগ্রহ জাগে। কিন্তু বি.এ. পাশ করার জন্য আরও নয় মাস আমাকে কলকাতায় অপেক্ষা করতে হবে। টেস্ট পরীক্ষার পর আমি বিপ্লবী কাজে যোগদান সম্পর্কে আলাপের জন্য একবার চট্টগ্রামে আসি।

(বিপ্লবী দলে যোগদানের পর থেকে প্রীতিলতার রোজনামচা লেখার অভ্যাস হয়। বাংলা লিখতে সে ভালোবাসত। রোজনামচায় প্রথম দিকে সে লিখত তার মনের বিচিত্র চিন্তাধারা, কোনো সময় কবিতা। কোনোদিন আবার লিখতও না। আবার যেদিন রাতের নির্জনতায় সে তার খাতা নিয়ে বসত, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা তার সুন্দর হস্তাক্ষরে ভরে উঠত, উচ্ছ্বাসে, বেদনায়, আশায় ও আকাঙ্ক্ষায়।

আলীপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে প্রীতিলতার এই সাক্ষাৎকার তার জীবনের এক বিশেষ রোমাঞ্চকর ঘটনা। পল পল করে মৃত্যুর ক্ষণ যার এগিয়ে আসছে, এই বিপুলা ধরণীর সুন্দর দীপ্তি যার জন্য যে কোনো দিন অকস্মাৎ লুপ্ত হয়ে যাবে, তেমন একটি মরণজয়ী বীরের সঙ্গে কথা বলা, মৃত্যুকে তুচ্ছ করার সুদৃঢ় পণের আভাস প্রত্যক্ষ করা, প্রীতিলতার বিপ্লবী জীবনে এক নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করল। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে জেলের মরণ কুঠুরীতে দেখা করে আসার পরে প্রীতিলতা তার রোজনামচায় এই কথাগুলো লিখেছিল।)

আই. এ. পরীক্ষা শেষ করে আমি চট্টগ্রামে আসি। ওই সময় মাস্টারদা সূর্য সেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক। তার সাথে আমার ভবিষ্যৎ কর্মকা- নিয়ে আলোচনা হয়।

(এ সময় প্রীতিলতার আই. এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। তিনি মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। মাসিক ২০ টাকা বৃত্তিও পাবেন তিনি। ঠিক হলো কলকাতার বেথুন কলেজে পড়াশুনা করবেন। ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে বি.এ. ভর্তি হলেন প্রীতিলতা। থাকেন ছাত্রীনিবাসে। এখানে মাস্টারদার নির্দেশে সাংগঠনিক কর্মকা- শুরু করলেন প্রীতিলতা। গড়ে তুললেন এক বিপ্লবী চক্র। এই বিপ্লবী চক্রে অনেক

মেয়ে সদস্য যোগ দিলেন। তাদের মূল কাজই হলোঅর্থ সংগ্রহ। অর্থ সংগ্রহ করে প্রীতিলতা চট্টগ্রামে পাঠাতে লাগলেন।)

মাস্টারদার নির্দেশ অনুযায়ী আমি বোমার খোল সংগ্রহ করার কাজ শুরু করি। ১৯২৯ সালে পূজার ছুটিতে আমি, কল্পনা দত্ত, সরোজিনী পাল, নলিনী পাল, কুমুদিনী রক্ষিতকে নিয়ে চট্টগ্রাম আসি। আমরা বোমার খোলগুলো পৌঁছে দেই বিপ্লবীদের হাতে। মাস্টারদার নির্দেশ অনুযায়ী আমি এরপর থেকে প্রকাশ্য বিপ্লবী কাজেও যুক্ত হয়ে পড়ি। অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভারও আমাকে তখন নিতে হয়। কলকাতায় যে বিপ্লবী চক্র গঠন করা হয়েছে, তাদের সকল প্রকার প্রশিক্ষণেও যুক্ত থাকি।

(বেথুন কলেজে ভর্তি হওয়ার কয়েক দিন পর কল্পনার সাথে রাণীর পরিচয় ঘটে। যাকে শিক্ষিকা উষাদি'র আলোচনা আড্ডায় প্রায়ই দেখতেন। বিপ্লবীচক্রে কল্পনাও যুক্ত হলেন। এই চক্রের মূল কাজই ছিল বিপ্লবীকর্মী তৈরির পাশাপাশি অর্থ সংগ্রহ করা। অর্থ সংগ্রহ করে প্রীতিলতা চট্টগ্রামে পাঠাতেন।)

(বি.এ. শেষ বর্ষে পড়াশুনাকালে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার দখল, জালালাবাদ সংঘর্ষ ও সেই যুদ্ধে তার আত্মীয় শহীদ হওয়ায় লেখাপড়ায় সে অমনোযোগী হয়ে ওঠে এবং রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির পর থেকে সে বি. এ. পরীক্ষা না দেয়ার জন্য মনস্থির করেন। কিন্তু তার শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে ডিসটিংশনে পাস করলেন।)

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল মহানায়ক সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম দখল হলো। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চট্টগ্রামে ইংরেজ শাসন অচল হয়ে গেল। টেলিগ্রাফ-টেলিফোন বিকল। সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। রিজার্ভ পুলিশ ছত্রভঙ্গ। রেললাইন উপড়ে ফেলা হলো। স্বদেশি বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম শহর দখল করে নিয়েছে। এ সময় আমি কলকাতায়। চট্টগ্রামে আসার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু তখনও মাস্টারদা'র অনুমতি মিলেনি।

বি.এ. পরীক্ষা শেষে মাস্টারদার নির্দেশে স্থায়ীভাবে চট্টগ্রামে চলে আসি। ১৯৩২ সালের শুরুতে বি.এ. পাস করার পর কর্মজীবনের শুরুতে চট্টগ্রাম অপর্ণাচরণ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হই। এ সময় বিপ্লবী কাজে আরো বেশি সক্রিয় হওয়ার তাগিদ দিল সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা সূর্য সেন।

“তোমাদের মধ্যে কে বাগানে দাঁড়ানো পাঁঠাটাকে কুপিয়ে হত্যা করতে

পারবে?"

(পূজা উপলক্ষে প্রীতির বাড়িতে মনোরঞ্জন রায় ও কল্পনা দত্ত নিমন্ত্রিত। একটি ঘরে তিনজন বসে গল্প করছেন। এমন সময় মনোরঞ্জন জানালা দিয়ে দেখলেন, বাগানে একটা পাঁঠা চরছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন। প্রীতি ও কল্পনাকে জিজ্ঞেস করলেন।)

"আমি পারবো। আমার মোটেই ভয় করবে না।"

(কল্পনা খুব চঞ্চল। মনোরঞ্জন প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা বললেন।)

"নিরীহ পাঁঠাটা তো কোনো দোষ করেনি। অহেতুক নিরীহ জীব হত্যা করতে আমি পারবো না। সময় আসলে আমি ঠিকই পারবো। স্বাধীনতার জন্য আমি প্রাণ দিতেও পারবো, প্রাণ নিতেও মোটেই কুণ্ঠাবোধ করবো না।"

(প্রীতি একটু চিন্তা করে ধীরে ধীরে বললেন।)

"জালালাবাদের শহিদদের জন্য আমি প্রাণে তীব্র বেদনা অনুভব করলাম। মনের এই রকম অবস্থায় আমি বি.এ. পড়বার জন্য কলকাতা চলে গেলাম। স্বদেশের কথা সব সময় আমার মন অধিকার করে থাকত। যে সব সন্তান স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মাহুতি দিয়েছে, সেই প্রিয় সন্তানদের বিচ্ছেদ বিধুরা জননীদের অশ্রু দেখতে পেতাম।

"মনের এই রকম অবস্থায় আমি নতুন উদ্দীপনা পেলাম, যখন আমার এক দাদা (মনোরঞ্জন রায়) আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে রামকৃষ্ণদার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। রামকৃষ্ণদা তখন একটি নির্জন সেলে স্বদেশপ্রেমের জন্য ব্রিটিশ আইনে চরম দ-ের অপেক্ষা করেছেন। আমি তাঁর এক সম্পর্কিত বোন বলে নিজের পরিচয় দিয়ে যেতাম এবং এই সপ্রতিভ, উৎফুল্ল, তরুণ বীরের সঙ্গে প্রতিদিন সাক্ষাৎ করতাম। ফাঁসির পূর্বে আমি তাঁর সঙ্গে প্রায় চল্লিশ বার সাক্ষাৎ করি।"

(প্রীতিলতা তাঁর 'বিদায়বাণী'তে লিখেছেন।)

"দাদা, আমি চট্টগ্রামে গিয়ে রামকৃষ্ণদার মাকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলাম। আলিপুর জেলে রামকৃষ্ণদার সাথে তাঁর মায়ের শেষ দেখা করিয়ে দিয়েছি। তাঁর মায়ের হৃদয়বিদারক কান্নার করুণ দৃশ্য দেখে আমি না কেঁদে পারিনি। রামকৃষ্ণদার ফাঁসির পর তাঁর মা বেনারস চলে যান। শুনেছি– বেনারসে তাঁর

মায়ের মৃত্যু হয়েছে।”

প্রীতিলতা বললেন,“আমি রামকৃষ্ণদার (শহিদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস) কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি– আমি তাড়াতাড়ি অ্যাকশনে যাবো এবং অ্যাকশনের জায়গায় প্রাণ বিসর্জন দেবো। তাছাড়া আমার পক্ষে পলাতক জীবন কাটানো সম্ভব নয়। কারণ আমাকে রক্ষা করতে গিয়ে আপনাদের মূল্যবান জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তা আমি হতে দিতে পারি না।”

(কথা প্রসঙ্গে প্রীতি বলছেন।)

“...কোন পথে জীবনকে আমি ভাসিয়ে দিলাম? এইতো আমার টেবিলের সামনে রাধাকৃষ্ণের ছবি। এই প্রেম স্বর্গীয়। এমনভাবেই মাতৃভূমিকে আমাকে ভালোবাসতে হবে। অন্য কোনো প্রেম ভালোবাসা আমার হৃদয়ে স্থান পাবে না। রাধার মতোই আমার দেশপ্রেম আমি উজাড় করে ঢেলে দেব, নিজেকে নিঃশেষে আমি দান করে যাব।”

(প্রীতিলতা তার রোজনামচায় একদিন লিখল।)

“সেদিন সকালেও ভোলার (অপূর্ব সেন) জ্বর নিয়ে সে কত হাস্যকৌতুক করেছে। আনন্দের এই নির্ঝরকে যতই দেখছিলাম, মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম। নির্মলদা (বিপ্লবী নেতা নির্মল সেন– লেখক) বলছিলেন, এই ভোলা হলো মাস্টারদার ÔA¨wm÷¨v›UÕ| ও বেশ ইংরেজি জানে। ওকে দিয়ে তিনি কত কিছু লেখান। ভোলা এর মধ্যে হঠাৎ একদিন বাড়ি গিয়েছিল। বাড়িতে তার অনেকগুলি বৌদি। বাড়ি থেকে চলে আসার সময় সে বৌদিদের ডেকে বলল, তোমরা সব ‘ফল ইন’ কর, আমি নমস্কার করব– আমার ‘কমাণ্ড’– বলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল অপূর্ব। আজ ভাবছি, ঐ রকম করে বিদায় নেওয়া তারই সাজে।

...ঐদিন সাগু ঠাণ্ডা করে অপূর্বকে খাওয়ালাম।

আমার হাতে জীবনের শেষ খাওয়া সে খেয়ে নিল। আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা হলে খেতে বসতে যাব, তখনই মাস্টারদা বললেন, “পুলিশ” “পুলিশ”। মাস্টারদাকে বললাম, আমি আপনাদের সঙ্গেই থাকব। তিনি চোখ বড় বড় করে বললেন, নীচে মেয়েদের মধ্যে চলে যাও, তাদেরই আত্মীয় বলে পরিচয় দিও। উপরে রইলেন মাস্টারদা, নির্মলদা আর ভোলা। ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন তখন সিঁড়ি বেয়ে রিভলভার হাতে উপরে উঠছে। নির্মলদা দাঁড়িয়ে তাকে গুলি করলেন। সাহেব ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন গুলিবিদ্ধ হয়ে নীচে পড়ে গেল। তারপর

দু'দিক থেকে কিছুক্ষণ গুলি চলল।

এমন সময় মাস্টারদা ও ভোলা নীচে নেমে এল। মাস্টারদার পাশে তখন ভোলা দাঁড়িয়ে। এত বিপর্যয়েও তার চোখে মুখে কোনো চাঞ্চল্য নেই, দেখে কি চমৎকার লেগেছিল। রিভলবারের ট্রিগারে হাতটি রেখে মাস্টারদার আদেশের অপেক্ষায় আছে। মাস্টারদা বললেন "চলো"। আমরা তিনজন রওনা হলাম। পিছন দিক দিয়ে বেরোবার সময় শুকনো পাতার উপর খসখস শব্দ হতেই অন্ধকারের বুকচিরে এক গুলি এসে অপূর্বর বক্ষভেদ করল। আমি আর মাস্টারদা অন্ধকারে নিরুদ্দেশ যাত্রা করলাম। রামকৃষ্ণদা বলছিলেন, ভোলার সঙ্গে আলাপ করতে। আলাপ চূড়ান্ত হয়ে গেল। গত দু'দিন ওর সঙ্গেই ছিলাম, তখন তার হাসিই কেবল শুনেছি, অবশেষে আমারই দু'চোখের সামনে সে মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।"

(সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে বিপ্লবীদের এক বৈঠকে প্রীতিলতা বলে, সে নেতাদের নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াবে। রান্নায় অপূর্বও তাকে সাহায্য করবে। প্রীতিলতার নিজের লেখা ডায়েরি থেকে।)

...১৯৩২ সালের মে মাসে ধলঘাটে সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে মাস্টারদাসহ সহযোদ্ধাদের সঙ্গে গোপনে বৈঠক শুরু হয়। এই বৈঠক চলাকালীন সময়ে ব্রিটিশ সৈন্যদের সাথে আমাদের বন্দুক যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে প্রাণ দেন বিপ্লবী নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন। মাস্টারদা আমাকে নিয়ে বাড়ির পাশে ডোবার পানিতে ও গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকেন। সৈন্যরা চলে যাওয়ার পর মাস্টারদা বলেন, 'প্রীতি, তুমি বাড়ি ফিরে গিয়ে স্কুলের কাজে যোগ দেবে, তাহলে গত রাতের ঘটনায় কেউ তোমাকে সন্দেহ করবে না।' সাবিত্রী দেবীর বাড়িটি পুলিশ পুড়িয়ে দেয়।

এই ঘটনার পর ব্রিটিশ সরকার আমাকে সন্দেহ করা শুরু করে। মাস্টারদার নির্দেশে আমি আত্মগোপনে চলে যাই। অন্য একটি বিপ্লবী গ্রুপ ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণে ব্যর্থ হয়। যার কারণে মাস্টারদা আমাকে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে বলেন। এই জন্য কাট্টলি সমুদ্র সৈকতে বিপ্লবী দলকে মাস্টারদা সামরিক প্রশিক্ষণ দেন।

ধলঘাট সংঘর্ষে নির্মলদা ও ভোলার প্রাণদান
১৩ জুন, ১৯৩২

ভাত খাওয়ার ডাক পড়ল। নির্মলদা খাবেন না আগেই বলেছেন। আমি সাধারণত নির্মলদার পাতে বসেই খেতাম। এবার মাস্টারদার সঙ্গে একসঙ্গে খেতে দিয়েছে দেখে এক দৌড়ে উপরে ছুটে গেলাম – উদ্দেশ্য নির্মলদাকে সরিয়ে আনা। বিছানায় শুয়ে শুয়ে না জানি তিনি তখন অমরলোকের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। আমি বললাম, "মাস্টারদার সঙ্গে খেতে লজ্জা করছে বলে পালিয়ে এসেছি। পালিয়ে এসেছি বলে আরও লজ্জা করছে।"

শুনে নির্মলদা হেসে আকুল, বললেন, "কেমন জব্দ এবার।" ঠিক এই সময় মাস্টারদা নিচ থেকে বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে বললেন, "পুলিশ এসেছে, পুলিশ এসেছে।"

বুঝলাম, এই মুহূর্তে সব শেষ হয়ে যাবে। ওঁদের বললাম, "আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব।" মাস্টারদা চোখ বড় বড় করে আদেশের স্বরে বললেন, "নিচে মেয়েদের মধ্যে চলে যাও, তাঁদেরই আত্মীয় বলে পরিচয় দিও।" থতমত করে নিচে নেমে গেলাম মই বেয়ে। এই সময় উপরে ভোলা, নির্মলদা ও মাস্টারদা।

ততক্ষণে ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন এসে রিভলবার হস্তে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করেছে। নির্মলদা দাঁড়িয়ে গুলি করলেন। মাস্টারদা টাকা-কড়ি সঙ্গে তুলে নিলেন। নির্মলদা গুলি চালিয়ে চললেন। সাহেব ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। দু'দিক থেকে গুলি চলতে থাকল। মাস্টারদারা উপর থেকে ও পুলিশবাহিনী নিচে থেকে। গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজের প্রতিধ্বনি হতে থাকল রাত্রির আকাশে, দু'একটা জয়ধ্বনিও আমার কানে গেল। গুলি চলল অবিরাম। অন্ধকার ঘর, অন্ধকার বাহির। হঠাৎ নির্মলদার

চিৎকার শুনতে পেলাম। আর স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না। উপরে উঠতে গেলাম। নিচের মেয়েরা তিনজনেই চেপে ধরল আমাকে।

ওদিকে নির্মলদার ব্যথাকরুণ কণ্ঠ– রাণী, রাণী। প্রাণপণ চেষ্টা করলাম একবার উপরে যেতে। ওদের কত ভয় দেখালাম, কত চোখ রাঙালাম, ছোট মেয়েটিকে একটি ঘুষিও দিলাম, কিন্তু কিছুতেই ওরা ছাড়ল না। প্রাণপণ করে একবার ওদের হাত ছাড়িয়ে মইটার অর্ধেকটা যেতে পেরেছিলাম, ওরা ছুটে গিয়ে আমাকে ফেলে দিল। তখনও উপর থেকে নির্মলদার আর্তস্বর– রাণী, রাণী, রাণী! প্রাণ কেড়ে নেওয়া এই ডাক আমার সহ্য হচ্ছিল না। এই অন্তিম সময়েও যদি একটিবার নির্মলদার কাছে যেতে পারতাম, জানি না আমায় কি বলতেন। ভগবান আমাকে একটিবার নির্মলদাকে দেখে আসতে দিল না।

এই ব্যর্থতা প্রতিনিয়ত আমার বুকে বিঁধে বিঁধে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিতে চাচ্ছে। এক-একবার মনে হচ্ছিল আর কি চাই। যাবার পথে বারে বারে কত ডেকে গেলেন। এমন সময় মাস্টারদা ও ভোলা (অপূর্ব সেন) নিচে নেমে এলেন দেখে ভারি আনন্দ হলো।

এতক্ষণ মনে হচ্ছিল, "ওরা কেউ... আর নেই।" মাস্টারদা আমাকে জড়িয়ে ধরে পরম স্নেহভরে বললেন, "তোকে এখন কোথায় নিয়ে যাব? তোর জীবনটাই মাটি করলাম।"

আমি মাস্টারদার পায়ের উপর উপুড় হয়ে বললাম, "মাস্টারদা, আমাকে ফেলে যাবেন না। আমি আপনাদের সঙ্গেই যাব।" এই সময় আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে মাস্টারদার সঙ্গ ছাড়ব না। মাস্টারদার পাশেই তখন ভোলা দাঁড়িয়ে ছিল। চোখের একটি পলকে তাকে আর একবার দেখে নিলাম। কী চমৎকার লেগেছিল। এত বড় বিপর্যয়েও চোখেমুখে এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। রিভলবারের ট্রিগারে আঙ্গুলটি রেখে মাস্টারদার আদেশের অপেক্ষায় আছে। মাস্টারদা বললেন, চলো।"

তিনজনেই রওনা হলাম, ভোলা চলল পথ দেখিয়ে আগে আগে। শুকনো পাতার উপর খসখস শব্দ হতেই অন্ধকারের বুক চিরে শব্দভেদী গুলি এসে ভোলার বক্ষ ভেদ করল। তখনও বাইরে উঠানে গুলিবর্ষণ চলছে।...

আমি ও মাস্টারদা অন্ধকারে নিরুদ্দেশ যাত্রা করলাম। রামকৃষ্ণদা বলেছিলেন, ভোলার সাথে আলাপ করতে। আলাপ চূড়ান্ত হয়ে গেল। দু'দিন ধরে কেবল ওর হাসি শুনছিলাম, অবশেষে আমারই দু'চোখের সামনে সে মরণের কোলে

ঝাঁপিয়ে পড়ল।

নির্মলদা আমাকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেকখানি আপন করে নিয়েছিলেন। যতই মনে পড়ে, নির্মলদা বলেছিলেন– চট্টগ্রাম শহরের বুকে একটা আগুন জ্বালিয়ে যাবেন, ততই সমস্ত অন্তর মথিত করে উৎসারিত হয়–

"মরমেই মরে গেল, মুকুলেই ঝরে গেল, প্রাণভরা আশা সমাধি পাশে।"

"১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে এক গুপ্ত আস্তানায়। পাহাড়তলীর ইউরোপিয়ান ক্লাবের উপর নৈশ আক্রমণ করা হবে। এর জন্য দলের সাহসী ও বিচক্ষণ কর্মীদের নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়েছে। এই দিনের সকল কার্যের নেতৃত্ব করতে হবে আমাকে।

"আমি মাস্টারদাকে বললাম, "মাস্টারদা, জীবনের এই শুভক্ষণটির জন্যই প্রহর গুনেছি। আজ আমার জীবনের যে শুভ প্রভাতের সূচনা আপনি করলেন, তার জন্য মৃত্যুর স্নেহশীল স্পর্শেও আমার হৃদয় থেকে আপনার জন্য সঞ্চিত শ্রদ্ধা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা মুছে যাবার নয়। কিন্তু মাস্টারদা, আমি যে অনুবর্তী কর্মী হয়েই কাজ করতে চাই। নায়িকার ভূমিকায় আমাকে ঠেলে দিচ্ছেন কেন?

"মাস্টারদা দৃঢ় অথচ আবেগকম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'বাংলার ঘরে ঘরে বীর যুবকদের আজ আর অভাব নেই। বালেশ্বর থেকে কালারপুল পর্যন্ত এঁদেরই দৃপ্ত অভিযানে দেশের মাটি বারে বারে তাজা রক্তে সিক্ত হয়েছে, কিন্তু বাংলার ঘরে ঘরে মায়ের জাতিও এবার যে শক্তির খেলায় মেতেছে ইতিহাসের সে অধ্যায় আজও অলিখিত রয়ে গেছে। তোমার সাফল্য বা তোমার আত্মদানে সে অধ্যায় রচিত হয়ে উঠুক– এই-ই আমি চাই। ইংরেজ জানুক, বিশ্বজগৎ অবলোকন করুক যে, এদেশের মেয়েরাও আজ আর পিছিয়ে নেই।

"মাস্টারদা প্রকোষ্ঠের গবাক্ষ পথে দূরের ওই পায়ে-চলা পথের দিকে বারেবারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলেন। প্রশ্ন করলাম, 'কারো কি আসার কথা, মাস্টারদা?' মাস্টারদা বাইরে দৃষ্টি রেখেই বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার সাথে একাজে যারা যাবে, তাদেরই প্রতীক্ষা করছি'।"

(১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কাট্টলী গ্রামে এক গোপন বৈঠকে মাস্টারদার নির্দেশে প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্ত দেখা করতে রওনা হন পুরুষের বেশে। কিন্তু পথে পাহাড়তলীতে কল্পনা দত্ত ধরা পড়েন। প্রীতিলতা নিরাপদে নির্দিষ্ট গ্রামে এসে পৌঁছেন। এখানেই পরিকল্পনা নেয়া হয় প্রীতিলতার নেতৃত্বে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করার।

আক্রমণে প্রস্তুতি নেয়ার জন্য কাট্টলীর সাগরতীরে প্রীতিলতা ও তার সাথীদের অস্ত্র শিক্ষা শুরু হয়। প্রীতিলতার নেতৃত্বে যেসব বিপ্লবীকে ওই আক্রমণ পরিচালনার জন্য নির্বাচিত করা হয় তারা হলেন, ১. শান্তি চক্রবর্তী– দক্ষিণ কাট্টলী, ডবলমুড়িং থানা, ২. কালী দে– গোসাইলডাঙ্গা, ডবলমুড়িং থানা, ৩. সুশীল দে– ধৈরলা, বোয়ালখালী থানা, ৪. প্রফুল্ল দাশ– কাট্টলী, ডবলমুড়িং থানা, ৫. মহেন্দ্র চৌধুরী– মোহরা, পাঁচলাইশ থানা।

১৯৩২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর মাস্টারদা প্রীতিলতাকে বললেন, পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্ব তোমাকে নিতে হবে।)

"মেয়েরা যে এখনও পিছিয়ে আছে তার কারণ তাদের পেছনে রাখা হয়েছে। নারীরা এখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে তারা আর পিছিয়ে থাকবে না এবং সংগ্রাম যতই কঠিন ও বিপদসঙ্কুল হোক না কেন, ভাইদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তারাও সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে। আমি আন্তরিকভাবে আশাকরি আমার বোনেরা আর নিজেদের দুর্বল ভাববেন না। এই আশা নিয়ে আমি আজ আত্মদানে অগ্রসর হলাম।"

(ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্বের বিষয়ে প্রীতিলতা তাঁর ডায়েরিতে 'ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের পূর্বে মাস্টারদা' শিরোনামে লিখেছেন।)

আমি কেমন করে বিপ্লবী সংস্পর্শে এলাম...

ডাঃ খাস্তগীর হাইস্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ার সময় আমি চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংগঠনের কথা জানতে পারি এবং পাই বিপ্লবী সংগঠনের নেতৃত্ব দেবার উপযুক্ত সর্বগুণসম্পন্ন এবং অত্যন্ত শক্তিশালী একজন এই দলের নেতা। ঢাকায় দু'বছর ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় আমি নিজেকে মাস্টারদার উপযুক্ত সহকারী হিসেবে গড়ে তোলবার জন্য চেষ্টা করতে থাকি। অবশ্য লেখাপড়ায় আমি অবহেলা করিনি, ১৯৩০ সালে মেয়েদের মধ্যে প্রথম এবং সবমিলিয়ে পঞ্চম স্থান অধিকার করে আমি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করি।

১৯৩০ সালের ১৯ এপ্রিল আমি পরীক্ষা শেষ করে বাড়ি ফিরে আসি এবং চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের (গত রাত্রের) গৌরবোজ্জ্বল কীর্তির কথা শুনতে পাই। এই মহান বীরদের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার অন্তর ভরে ওঠে। কিন্তু এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে আমি কোনো অংশ নিতে পারলাম না বলে এবং যে মাস্টারদার নাম শোনার পর থেকে শ্রদ্ধা করে আসছি তাঁকে একবার চোখের দেখাও দেখতে পেলাম না বলে আমার মনে খুব দুঃখ হলো। জালালাবাদের শহিদের জন্য আমার অন্তরে তীব্র বেদনা অনুভব করলাম। মনের এই অবস্থায় আমি বি. এ. পড়তে কলকাতায় চলে এলাম। আমার স্বদেশের কথা তখন সর্বদাই আমার মনে জেগে থাকতো। যে সন্তানেরা স্বাধীনতার বেদীমূলে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, সেই প্রিয় সন্তান বিচ্ছেদ-বিধূরা জননীদের শোকাশ্রু আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেতাম।

মনের এই রকম অবস্থায় আমার এক দাদা আমাকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস তখন একটি নির্জন সেলে নিজের দেশকে ভালোবাসার জন্য চরম দ-ের অপেক্ষা করছেন। এই সাক্ষাৎকার আমাকে নতুন উদ্দীপনা এনে দিল। আমি রামকৃষ্ণদার মাসতুতো বোন হিসেবে যেতাম এবং প্রায় প্রতিদিনই আমি এই সপ্রতিভ আনন্দোজ্জ্বল তরুণ বীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম। প্রাণদ-ের আগে প্রায় চল্লিশ দিন আমি

তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁর আত্মমর্যাদা ভাব, সহজ কথাবার্তা, মৃত্যুর কাছে শান্ত আত্মসর্মপণ, অকপট ঈশ্বর-ভক্তি; শিশুসুলভ সরলতা, স্নেহপূর্ণ হৃদয়, গভীর জ্ঞান ও সুগভীর অনুভূতি আমাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং আগের চেয়ে দশগুণ প্রগতিশীল করে তুলেছিল। মৃত্যুপথযাত্রী দেশপ্রেমিকের সান্নিধ্য আমার জীবনকে পূর্ণ করে তুলতে প্রভূত পরিমাণ সাহায্য করেছিল। রামকৃষ্ণদার প্রাণদ-ের পরে কোনো একটি বাস্তব বৈপ্লবিক অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। অবশ্য, আমাকে আমার বি. এ. পরীক্ষার জন্য আরও নয় মাস কলকাতায় থাকতে হলো। এর মধ্যে আমি কয়েকবার মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই।

১৯৩২ সালে আমার পরীক্ষার পর যে কোনো উপায়ে মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করার জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসি। অল্প ক'দিনের মধ্যেই আমার দীর্ঘ দিনের আশা পূর্ণ হলো, চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের দুই নেতা মাস্টারদা ও নির্মলদার সামনে আমি উপস্থিত হই।

নির্মলদার সঙ্গে অল্প ক'দিনের সাক্ষাতেই আমি তাঁর চরিত্রের সুদৃঢ় নীতিবোধ এবং গভীর কর্মবোধের সমন্বয় লক্ষ করেছি। আমার সৌভাগ্য যে, আমি এই মহাত্মার সংস্পর্শে আসতে পেরেছিলাম। তাঁর দেশের লোক জানলো না কত বড়, কত পবিত্র, কি অসাধারণ এক মানুষ নিঃশব্দে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন।

নির্মলদার শোচনীয় মৃত্যু আমাকে তীব্র আঘাত হানল এবং আমি আরো মরিয়া হয়ে উঠলাম। এই সময় আমার বি. এ. পরীক্ষার ফল বেরল এবং আমি ডিস্টিংশনে পাশ করলাম। এর কিছুকাল পরেই আমি আমার প্রিয় পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের চিরদিনের জন্য ছেড়ে এসে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে বৈপ্লবিক কাজে আত্মনিয়োগ করলাম।

শৈশব থেকেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে অখ- বিশ্বাস ও দৃঢ়তা আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই সম্পদ আমি সারা জীবন রক্ষা করেছি এবং আজ যখন আমি তাঁর জীবনে আত্মসমর্পণ করতে চলেছি তখন এই সম্পদ যেন আরও সুখকর, আরও মূল্যবান, আরও দীপ্তমান বলে মনে হচ্ছে। আমার বিপ্লবী আদর্শ যদি সর্বশক্তিমানের ভক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলে যেতে না পারত তাহলে বোধ হয় আমি কখনও বিপ্লবী হতে পারতাম না।

২৩শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা। আমি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে জবাবদিহি করতে বসেছি, লিখছি আমার কথা। হয়তো শেষ কথা, শেষ লেখা। এ লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি হৃদয় থেকে। বিশেষত আমি মেয়ে, কল্যাণী-করুণাময়ী মাতা-ভগ্নি-জায়াদের দলের। তারপরও এই নিষ্ঠুর মরণখেলায় কেন ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছি তার কৈফিয়ত দেয়া দরকার। কোন এক ইংরেজ কবি লিখেছিলেন, 'বাঙালি মায়েদের মতো কোমল'। সে কোমল জাতির মেয়ে কেন মহা ভয়াল মৃত্যুরূপা হয়ে আবির্ভূতা তার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যায় আমার এই লেখা বা জবাবদিহি।

"আমি বিধিপূর্বক ঘোষণা করিতেছি, যেই প্রতিষ্ঠানের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অত্যাচারীর স্বার্থ সাধনে প্রয়োগকারী সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধন করিয়া আমার মাতৃভূমি ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাসনে প্রবর্তন করিতে ইচ্ছুক আমি সেই ভারতীয় রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার একজন সদস্যা।

এই বিখ্যাত "চট্টগ্রাম শাখা" দেশের যুবকদের দেশপ্রেমকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। স্মরণীয় ১৯৩০-এর ১৮ই এপ্রিল এবং উহার পরবর্তী পবিত্র জালালাবাদ ও পরে কালারপোল, ফেনী, ঢাকা, কুমিল্লা, চন্দননগর ও ধলঘাটের বীরোচিত কার্যসমূহ ভারতীয় মুক্তিকামী বিদ্রোহীদের মনে এক নতুন প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছে।

আমি এইরূপ গৌরবমি-ত একটি সংঘের সদস্যা হইতে পারিয়া নিজেকে সৌভাগ্যবতী অনুভব করিতেছি।

আমরা দেশের মুক্তির জন্যই এই সশস্ত্র যুদ্ধ করিতেছি। অদ্যকার পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ স্বাধীনতা যুদ্ধেরই একটি অংশ।

ব্রিটিশ জোরপূর্বক আমাদের স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইয়াছে। ভারতের কোটি কোটি নর-নারীর রক্তশোষণ করিয়া তাহারা দেশে নিদারুণ দুর্দশার সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারাই আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্বংসের এবং সকল অধঃপতনের একমাত্র কারণ। সুতরাং তাহারাই আমাদের একমাত্র শত্রু। স্বাধীনতা লাভ করার পথে তাহারাই আমাদের একমাত্র অন্তরায়। যদিও

মানুষের জীবন সংহার করা অন্যায়, তবুও বাধ্য হইয়া বড় বড় সরকারি কর্মচারীর ও ইংরেজদের জীবন সংহার করিতে আমরা অস্ত্রধারণ করিয়াছি। মুক্তিপথের যেকোনো বাধা বা অন্তরায় যেকোনো উপায়ে দূর করার জন্য আমরা সংগ্রাম করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

আমাদের দলের মহামান্য ও পূজনীয় নেতা মাস্টারদা অদ্যকার এই সশস্ত্র অভিযানে যোগ দিবার জন্য যখন আমাকে ডাক দিলেন, তখন আমি নিজেকে যথেষ্ট সৌভাগ্যবতী মনে করিয়াছিলাম। মনে হইল, এতদিনে আমার বহু প্রত্যাশিত অভীষ্ট সিদ্ধ হইল এবং সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া আমি এই কর্তব্যভার গ্রহণ করিলাম। এই উন্নত ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট নেতৃত্ব যখন আমার মতো একটি মেয়েকে এই গুরুভার অর্পণ করেন তখন এতগুলি কর্মঠ ও যোগ্যতর ভাইয়েরা বর্তমান থাকিতে অভিযানে নেতৃত্বের ব্যাপারে একজন ভগিনীর উপর কেন ন্যস্ত হইবে, এই বলিয়া আমি আপত্তি জানাইলাম এবং একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে ওই কাজে যাইতে চাহিলাম।

কিন্তু পরে আমি পূজ্য নেতার আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইলাম।...

আমি মনে করি যে, আমি দেশবাসীর নিকট আমার কাজের কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ এখনও হয়ত আমার প্রিয় দেশবাসীর মধ্যে এমনও অনেক আছেন, যাঁহারা বলিবেন যে– ভারতীয় নারীত্বের ঊর্ধ্বতন আদর্শে লালিত একটি নারী কি করিয়া নরহত্যার মতো এই ভীষণ হিংস্র কাজে লিপ্ত হইল।

দেশের মুক্তি সংগ্রামে নারী ও পুরুষের পার্থক্য আমাকে ব্যথিত করিয়াছিল। যদি আমাদের ভাইয়েরা মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারে, আমরা ভগিনীরা কেন উহা পারিব না? ইতিহাসে অনেক উদাহরণ আছে, রাজপুত রমণীরা অসীম সাহসের সহিত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিতেন এবং স্বদেশের স্বাধীনতা ও নারীত্বের মর্যাদা রক্ষার জন্য তাহারা শত্রুর প্রাণসংহার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না। ইতিহাসের পৃষ্ঠা এইরূপ আরও কত নারীর বীরত্বগাঁথায় পূর্ণ। তবে কেন আমরা আজিকার ভারতীয় নারীরা বিদেশির দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে নিজের দেশকে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য এই মহান যুদ্ধে যোগদান করিব না? যদি বোনেরা ভাইদের সঙ্গে কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিতে পারে, তবে সশস্ত্র বিদ্রোহে যোগদানে তাহাদের বাধা কি? সশস্ত্র বিদ্রোহে অন্য দেশে বহু নারী যোগদান করিয়াছে, তবে কেন ভারতীয় নারীরা বিপ্লবের এই পন্থাকে অন্যায় বলিয়া মনে করিবে?

নারীরা আজ কঠোর সংকল্প নিয়াছে যে তাহারা আর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে

না। নিজ মাতৃভূমির মুক্তির জন্য যে কোনো দুরূহ বা ভয়াবহ ব্যাপারে ভাইদের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিতে তাহারা ইচ্ছুক– ইহা প্রমাণ করিবার জন্যই আজিকার এই অভিযানের নেতৃত্ব আমি গ্রহণ করিতেছি।

আমি ঐকান্তিকভাবে আশা করি যে, আমার দেশের ভগিনীরা আর নিজেকে দুর্বল মনে করিবেন না। সশস্ত্র ভারতীয় নারী সহস্র বিপদ ও বাধাকে চূর্ণ করিয়া এই বিদ্রোহ ও সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলনে যোগদান করিবেন এবং তাহার জন্য নিজেকে তৈয়ার করিবেন– এই আশা লইয়াই আমি আজ এই আত্মদানে অগ্রসর হইলাম।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
(স্বাক্ষর)
২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২ইং

(প্রশিক্ষণ শেষে বীরকন্যা প্রীতিলতার নেতৃত্বে বিপ্লবীরা ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর রাত্রে পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করে সফল হন। আক্রমণ শেষে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার সময় প্রীতির বাঁ-পাশে গুলির আঘাত লাগে। সেই আঘাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল কম। ক্লাব আক্রমণ শেষ করে ফেরার সময় কালীকিঙ্কর দেখলেন, প্রীতির পরনের জামা রক্তে লালে লাল। মনে হচ্ছে প্রীতি যেন হোলি খেলে ফিরছেন।

প্রীতিলতার নির্দেশে আক্রমণ শেষে বিপ্লবী দলটি স্থানত্যাগ করল। বিপ্লবী বন্ধুদের সঙ্গে বেশ কিছুদূর এগিয়ে এলেন প্রীতিলতা।

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রীতিলতা তাঁর নিজের কাছে সযত্নে রাখা পটাশিয়াম সায়নাইড মুখে পুরে দিলেন। তাঁর পা আর চলছে না। প্রীতিলতা কালীকিঙ্করকে তাঁর রিভলবারটি দিয়ে দিলেন।)

প্রীতিলতা কালীকিঙ্করকে বললেন, "কালীদা, আপনার সায়নাইড আমাকে দিন। আমার এইটুকু আমি খেয়েছি।" এই বলেই প্রীতিলতা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

(আক্রমণ শেষে ধরা পড়ার আগে সঙ্গে রাখা সায়নাইড বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। কারণ ধরা পড়লে বিপ্লবীদের অনেক গোপন তথ্য ব্রিটিশ পুলিশের মারের মুখে ফাঁস হয়ে যেতে পারে।)

মায়ের কাছে লেখা প্রীতিলতার চিঠি

কলকাতা

শ্রীচরণেষু

মা, অনেকদিন ধরিয়া তুমি আমার কাছে চিঠিপত্র লিখিতেছ না। মা, তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ? তুমি রাগ করিও না– তাহা হইলে আমি খুব মনে কষ্ট পাইব। তোমরা এত কষ্ট করিয়া আমাকে মানুষ করিতেছ– জানি না তোমাদের প্রতি এতটুকু কর্তব্য করিতেও সক্ষম হইব কিনা। আমার শুধু... কিছু হইবে না। আবার মনে হয় তোমরা বেশিদিন বাঁচিবে না। শরীরের প্রতি যত্ন নিও। মন খারাপ করিয়া থাকিও না। ভগবান যদি থাকেন তবে দিন একভাবে চলিবেই। সুখ-দুঃখ মানুষের মনের শক্তির উপরই নির্ভর করে।

আমি ভালো আছি। প্রণাম জানিও।

ইতি

তোমার স্নেহের রাণী।

বাবার কাছে লেখা প্রীতিলতার চিঠি

Calcutta

13. 04. 31

My dear father

I received your letter in time. I read newspaper every day. The atmosphere of Chittagong appears to be quiet at present.

Yesterday I got my scholarship amounting to Rs. 20 only. But once I paid Rs. 15 as my migration fee. I presented my migration certificate to... office also I had to fill up a registration form.

I may require some money from you next month. As the college will close at that time I shall have to pay in college fees... I have... notes on Psychology... of the Scottish Church College through nation...

I am well & hope you all to be so. Pranam to you father.

Your

Affectionate daughter

Rani

অজ্ঞাতবাস থেকে মায়ের কাছে লেখা প্রীতিলতার চিঠি

মাগো,

তুমি আমায় ডাকছিলে? আমার যেন মনে হলো তুমি আমার শিয়রে বসে কেবলি আমার নাম ধরে ডাকছো, আর তোমার অশ্রু-জলে আমার বক্ষ ভেসে যাচ্ছে। মা, সত্যিই কি তুমি এত কাঁদছো? আমি তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না– তুমি আমায় ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে চলে গেলে।

স্বপ্নে একবার তোমায় দেখতে চেয়েছিলাম– তুমি তোমার আদরের মেয়ের আবদার রক্ষা করতে এসেছিলে! কিন্তু মা, আমি তোমার সঙ্গে একটি কথাও বললাম না। দু'চোখ মেলে কেবল অশ্রু জলই দেখলাম। তোমার চোখের জল মোছাতে এতটুকু চেষ্টা করলাম না।

মা, আমায় তুমি ক্ষমা করো– তোমায় বড় ব্যথা দিয়ে গেলাম। তোমাকে এতটুকু ব্যথা দিতেও তো চিরদিন আমার বুকে বেঁধেছে। তোমাকে দুঃখ দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়। আমি স্বদেশ-জননীর চোখের জল মোছাবার জন্য বুকের রক্ত দিতে এসেছি। তুমি আমায় আর্শীবাদ কর, নইলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না।

একটিবার তোমায় দেখে যেতে পারলাম না। সেজন্য আমার হৃদয়কে ভুল বুঝ না তুমি। তোমার কথা আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিনি মা। প্রতিনিয়তই তোমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

আমার অভাব যে তোমাকে পাগল করে তুলেছে, তা আমি জানি। মাগো, আমি শুনেছি, তুমি ঘরের দরজায় বসে সবাইকে ডেকে ডেকে বলছো– "ওগো তোমরা আমার রাণীশূন্য রাজ্য দেখে যাও।"

তোমার সেই ছবি আমার চোখের ওপর দিনরাত ভাসছে। তোমার এই কথাগুলো আমার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কান্নার সুর তোলে।

মাগো, তুমি অমন করে কেঁদো না! আমি যে সত্যের জন্য– স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি, তুমি কি তাতে আনন্দ পাও না?

কি করবে মা? দেশ যে পরাধীন! দেশবাসী যে বিদেশির অত্যাচারে জর্জরিত! দেশমাতৃকা যে শৃঙ্খলভারে অবনতা, লাঞ্ছিতা, অবমানিতা!

তুমি কি সবই নীরবে সহ্য করবে মা? একটি সন্তানকেও কি তুমি মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতে পারবে না? তুমি কি কেবলই কাঁদবে?

আর কেঁদো না মা। যাবার আগে আর একবার তুমি আমায় স্বপ্নে দেখা দিও। আমি তোমার কাছে জানু পেতে ক্ষমা চাইবো।

আমি যে তোমার মনে বড়ই ব্যথা দিয়ে এসেছি মা! ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে আসি! তুমি আদর করে আমাকে বুকে টেনে নিতে চাইছো, আমি তোমার হাত ছিনিয়ে চলে এসেছি। খাবারের থালা নিয়ে আমায় কত সাধাসাধিই না করেছো– আমি পেছন ফিরে চলে গেছি।

না, আর পারছি না। ক্ষমা চাওয়া ভিন্ন আর আমার উপায় নেই। আমি তোমাকে দু'দিন ধরে সমানে কাঁদিয়েছি। তোমার কাতর ক্রন্দন আমাকে এতটুকু টলাতে পারেনি।

কি আশ্চর্য মা! তোমার রাণী এত নিষ্ঠুর হতে পারলো কি করে? ক্ষমা করো মা; আমায় তুমি ক্ষমা করো!'

ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের উদ্দেশ্যসম্বলিত ইশতেহার

১নং ইশতেহার

ভারতের গণতন্ত্র বাহিনী আজ এই এক রক্তাক্ত প্রতিশোধ গ্রহণে এগিয়ে এসেছে এবং ব্রিটিশ শাসকবর্গকে জানিয়ে দিচ্ছে যে ভারতের জনগণ আজ যতই দুর্বল ও অসহায় হোক না কেন তারা এইরূপ যথেচ্ছ বর্বরতা নির্বিকার চিত্তে এবং নীরবে আর কখনও মেনে নেবে না এবং আজ তারা একথাও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণায় জানিয়ে দিচ্ছে যে ভারতের গণতন্ত্র বাহিনী এতদিন পর্যন্ত কেবলমাত্র সরকারি মহলের দিকে লক্ষ রাখলেও এখন থেকে ভারতে অবস্থিত ইউরোপিয়ানগণের বিরুদ্ধেই তাদের সাধারণ অভিযান আরম্ভ করবে এবং নির্বিচারে সকল ইউরোপীয়কে হত্যা করবার জন্য ও তাদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি অধিকার করে নেবার জন্য ঢালাওভাবে আদেশ জারি করেছে।

(সূর্য সেনের বিচারে হাইকোর্টের রায় থেকে উদ্ধৃত)

২নং ইশতেহার

ভারতের গণতন্ত্র বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সৈনিক আমরা। আমাদের ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল তারিখের ঘোষণা অনুযায়ী ভারতে অবস্থিত ইংরেজদের, তারা সরকারের সদস্য হোক অথবা বেসরকারি ব্যক্তি হোক, ব্যবসায়ী হোক অথবা কৃষিজীবী হোক, তাদের প্রাণের বিরুদ্ধে আজ থেকে আমাদের অভিযান আরম্ভ করছি। তারাই আমাদের দেশের সর্বনাশের একমাত্র কারণ। আমাদের দেশের জনগণের উপর বর্বর নির্যাতন, যেমন হচ্ছে চট্টগ্রামে, হিজলীতে, জালিয়ানওয়ালাবাগে এবং অনুরূপ বহুস্থানে, তার দায়িত্ব একমাত্র তাদেরই। তারাই আমাদের দেশের নিকৃষ্টতম শত্রু। আমাদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম বহু পূর্বেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। আমাদের আজকের অভিযান তারই সাথে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট।

আমরা ভগবানের আশীর্বাদ এবং আমাদের অভিযানে তাঁর সহায়তা কামনা করি ।

(ব্রিটিশ হাইকোর্ট কর্তৃক সূর্য সেন বিচারের রায় থেকে উদ্ধৃত)

চট্টগ্রাম ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের পরে পুলিশ ও মিলিটারি এসে মৃত ও আহত ইংরেজ নর-নারীদের ক্লাবের ভেতর থেকে বারান্দায় এনে পাশাপাশি রাখে । কিছুক্ষণ পরে তারা প্রীতিলতার খাকি সামরিক পোশাক পরিহিত মৃত দেহটিও পায় তখনও তারা ওই মৃতদেহ যে একজন নারী বিপ্লবীর তা বুঝতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে ওই মৃতদেহ শহরে কোতোয়ালী থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দেহ তল্লাসী করে প্রীতিলতার কাছে পাওয়া যায় :

১ । মাথার পাগড়ী– এটা খোলার পরই তার দীর্ঘ কেশ মাটিতে এলিয়ে পড়ে;

২ । পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাবের “প্ল্যান”;

৩ । শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফটো;

৪ । ভারতীয় রিপাবলিক্যান আর্মির একটি বিজ্ঞপ্তি যাতে প্রীতিলতার ফটো ছাপানো ছিল;

৫ । একটি ‘হুইসেল’;

৬ । একটি নিজের হাতে লেখা বিবৃতি ।

বিপ্লবী নির্মল সেন

প্রীতিলতা

K›UK-gKU wk‡i c‡iwQ‡j e‡j
AvR KZ †Kwnbi Ze c`Z‡j!

সেই গভীর নিশীথে পল্লীর কোন এক অন্ধকার জীর্ণ-শীর্ণ কুটিরে বহু পুণ্য বলে নির্মলদার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, জীবনের সেই শুভ মুহূর্তটিকে শত ক্রন্দনেও আর ফিরিয়ে আনতে পারব না। কারণ আজও সেই সবই তেমনি ভাবে আছে। আমিও আছি, আমার জীবনে আরও কত রজনীই এসে গেল: কিন্তু নাই কেবল সেই মহিমান্বিত তেজস্বী মানুষটি যাঁর উপস্থিতি সেইদিন সেই পর্ণ-কুটির আলো করে দিয়েছিল। বিপ্লবীর কি মনোহর রূপই না সেদিন দেখেছিলাম। অন্ধকারে চোখ দুটি বেরিয়ে আসছে। তাঁর মুখের কথার চাইতে আমার ঐ তেজময় চোখের চাহনিই অনেক বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছিল। পেছনে মেশিনের ব্যাগটা ঝুলছে, সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জ্বল বৃহৎ চক্ষু কথাবার্তা বলার পরে যখন উঠে দাঁড়ালেন মনে হলো যেন বংশীবাদক পলাশ পদ্মলোচন কদমতলা ছেড়ে সুদর্শন চক্র হস্তে সমরপ্রাঙ্গণে এসে পাঞ্চজন্যে ফুৎকার দিয়ে সপ্তকোটি বীরসন্তানকে মুক্তির জন্যে মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান করছেন।

নির্মলদা আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমায় কে কী বলেছে। বললাম, সবটুকু গুছিয়ে এইটুকু সময়ের মধ্যে কি করে বলব? যা যা মনে আসবে তাই বলে যাচ্ছি। রামকৃষ্ণদা (রামকৃষ্ণ বিশ্বাস) যে বলেছিল... Nirmal da is the last man to be captured. He is very intelligent- এই কথাটাই প্রথমে বললাম। তারপর রামকৃষ্ণদার কয়েকটি কথা হুড়হুড় করে বলে গেলাম। কী কী বলেছিলাম ঠিক মনে নেই। তবে এই দুটো কথা বলেছিলাম, "No revolutionary can die with satisfaction. আমি যদি এখন বের হই, তবে I shall declare equal right to brothers and sisters.

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভধসরষু-র প্রতি আমার কীরূপ টান আছে। বললাম টান আছে, কিন্তু duty to family-কে duty to country-র কাছে বলি দিতে পারব।

পরীক্ষা কেমন দিয়েছি, পাস করব কিনা সব জানতে চাইলেন। বললাম, পাস করব বলেই মনে হচ্ছে।

সেদিন যখন পাসের খবরটা পেলাম, মনে পড়ে গেল নির্মলদা প্রথম দিনই আমাকে পাস করার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমার তো বিশ্বাস, যে যায় সে একেবারে চলে যায় না। আমাদের অন্তরে বেঁচে থাকে। এবং প্রাণের যা কিছু নিবেদন সবই তাঁর কাছে পৌঁছায়। তাই মনে মনে খবরটা নির্মলদার কাছে পাঠিয়ে দিলাম, কিন্তু তবুও হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশ থেকে একটা গভীর বিচ্ছেদ ব্যথার সুর বেজে উঠে। মানবহৃদয়ের এইসব অতি সাধারণ সুখ-দুঃখের কাহিনি যুগ যুগান্তর ধরেই চলেছে। কিন্তু আমরা এ সবের যথার্থ অর্থ গ্রহণ করতে পারি না বলেই বিশ্বের বুকে এত হাহাকার, হা-হুতাশ আর ক্রন্দন। আমরা ভুলে যাই যে, শুভপ্রভাতে দুঃখের সঙ্গে একান্ত বোঝাপড়া করে নিতে পারব সে দিনই অমৃতের সন্ধান পাব।

তারপর আমি যখন বললাম যে, পাস করতে পারব, তখন বললেন, "তোমার কাছ থেকে Extreme successdemand করি, আগামী Convocation-এ একটা Attempt নিতে পারবে তো?"

আনন্দে আমার অন্তর ভরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্জয় অভিমান এসে মনটা জুড়ে বসল এই ভেবে যে, এতদিন পরে মনের ইচ্ছেটা জানাবার সুযোগ পেলাম। তাই নির্মলদার এই প্রশ্নের উত্তরে বলে বসলাম, পারব না কেন? আপনারা তো বোনদের আমল দেন না। আমার কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন, "কেবল তোমাকে একলা বললাম– আমি অনেকদিন থেকেই জানি।" আমার সঙ্গে যে উনি দেখা করেছেন সেই আনন্দেই তখন বিভোর ছিলাম। অথচ সেই সময় একথা বলার কারণ আর কিছুই নয়, অভিমান। তারপর আমাকে এই কথাগুলো বললেন, "পাস করবার পর যে কোনো District-এ একটা কাজ নেবার চেষ্টা করো। যেমন ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাঁকুড়া ইত্যাদি। সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনার সবার নাম একেবারে মুখস্থ করে বসবে। কখন কোথায় Meeting হয় সব খবর রাখবে এবং Opportunity খুঁজে বেড়াবে।"

একটা ঈড়ফব বলে দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আগে রমণের (বীরাঙ্গনা কল্পনা দত্ত) through-তে যে ঈড়ফবপাঠিয়েছিলেন তা সে বলেছে কি না এবং কী বলেছে।

তারপর বললেন, “আমাদের ইচ্ছা যাবার আগে আর একটা কিছু করে যাই! এবার আমরা চাই যে একটা Fight between intelligent and intelligent হোক।”

“যত তাড়াতাড়ি পারি করে যাব, কারণ কখন ধরা পড়ি ঠিক নাই। এত কিছুর মধ্যেও যে এতদিন ধরা পড়িনি, সেজন্য আমাদের Thanks দেওয়া উচিত।”

দ্বিতীয়বার যখন দেখা হয়, তখন বলেছিলেন, “চাঁটগা শহরের উপর একদিন আগুন জ্বালিয়ে দেব। হঠাৎ একদিন শুনতে পাবে যে পৃথিবীর বুকের উপর থেকে কয়েকজন Revolutionist crushed হয়ে গেছে।”

যখন কথা বলতেন, ভাবতাম এমন ছেলে থাকতে ভারতের আজ দুর্দশা কেন? যে দেশের সন্তান এমন করে মুক্তির জন্য মরণকে তুচ্ছ করতে পারে সেই দেশের আবার কীসের দৈন্য? কবি সত্যই গেয়েছেন :

†K e‡j †Zvgvq Kv½wjbx

I‡Mv Avgvi fviZivYx|

তারপর বললেন, “আমাদের সাথে যদি আর দেখা না হয়, তবে চিরদিন আমাদের কথা মনে রেখ।” আমি বললাম, “সে কথা কি আর বলে দিতে হবে।”

মেশিনটা বের করে বললেন, “আর কোনোদিন দেখেছ কি?” খুব ছোট একটি মেশিন একবার দেখেছিলাম, তাই বললাম। মেশিনের কোন চধৎঃ-কে কী বলে, কী করে গুলি করতে হয় সব দেখিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আমি তো এখন পর্যন্ত একটুখানি Training-ও পেলাম না, কাজ করব কী করে? বললেন, “বাড়ি থেকে আর কোথাও যাচ্ছি বলে চলে আসতে পারবে তো?” পারব বললাম। ও-রকম করে এসেই তো Training নিতে হবে। সেদিন আর বেশি কথা হয়নি। আমি যখন রমনকে ডেকে দিতে আসছি তখন বললেন, “তোমাকে তো ভালো করে দেখলাম না, আচ্ছা, আমি একবার ওই ঘরে যাব, তুমি আমায় চিনতে পারবে তো।” বললাম– চিনব। অন্ধকারে যতখানি পারা যায় নির্মলদাকে দেখে নিয়েছিলাম এবং যখন এ কথা জিজ্ঞেস করলেন, মনে মনে বললাম, আর কিছু দেখে না চিনি চোখ দুটো তো চিনবই।

এইভাবে প্রথম দিনের সাক্ষাৎ শেষ হলো। কী অনুভূতি নিয়ে যে সেদিন ফিরে গেলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এ-সবজনের সঙ্গে দেখা হলো, এবার মাস্টারদার দেখাও পাব– এ আশা নিয়ে সেদিন ফিরেছিলাম। তিন সপ্তাহ পরে

আবার দেখা করতে যাওয়ার দিন ঠিক হলো। এবার কেবলই মনে হচ্ছিল যে, মাস্টারদার সঙ্গেও নিশ্চয়ই দেখা হবে।

চাঁদের আলোতে যখন আমাদের নৌকাখানি স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছিল, মনে পড়ল রামকৃষ্ণদার কথা। আমার কাছেও একদিন কি উৎসাহ ভরেই না বন্ধুদের সঙ্গে এক নৌ-অভিযানের গল্প করেছিল। নৌকা ভেসে চলেছে। চারদিকের গাছপালা মাঠ-ঘাট সব দেখে মনে হচ্ছিল, চট্টলা মায়ের প্রতিটি অঙ্গে বিপ্লবী ভাইদের কত ইতিহাসই না লেখা রয়েছে। নৌকা করে যখন মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করে চলেছি, মনে হলো আমার এতদিনের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। আমি কতদিন জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখেছি– এমনি করে দেবতা দর্শনে চলেছি।

একটা ছোট কুটিরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, নির্মলদা একটা লুঙ্গি পরে উঠানে পায়চারি করছেন। আমাকে দেখেই এগিয়ে এলেন এবং বললেন, "খুব ক্লান্ত হয়েছ বুঝি? এতক্ষণ দেরি দেখে আমি তো ভাবছি, মাঝি তোমাকে মেরে গয়না-পত্র চুরি করে নিল।" দু'জনেই হাসলাম। আমাকে সিঁড়ির কাছে ডেকে নিয়ে বিধবা মহিলাটিকে (সাবিত্রী দেবী) কী বলব সব বলে দিলেন। তারপর নিতান্ত শিশুটির মতো হাসতে হাসতে বললেন, "তোমার তো হাতে শাঁখা নাই, কপালে সিঁদুর নাই, মহিলা যদি সন্দেহ করে?" কথাগুলো বলবার ভঙ্গি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। শিশুর মতো উলঙ্গ প্রাণ না হলে কি এরা শহরকে এতখানি আপন করে নিতে পারে।

আমার আশা নিষ্ফল হলো না। নির্মলদা বললেন, "মাস্টারদা এখানে আছেন।" আনন্দে প্রাণ ভরে গেল।

নির্মলদা পুকুর থেকে এক ঘটি জল এনে দিয়ে বললেন, "হাত পা ধোও"। আর শুধু মুখ ধুয়ে যখন ঘরে গেলাম, তখন বলছিলেন, পা ধুলে না কেন? এমন লক্ষ্মীছাড়ামি করলে চলবে না।"

নির্মলদা যখন এরূপ ধরনের কথাগুলো বলতেন, আমার ভারি চমৎকার লাগত। তারপর মাস্টারদা ঘরের ভেতর এলেন। পরে নির্মলদা আস্তে আস্তে বললেন, প্রণাম কর। সেই রাত্রিতে নির্মলদার বাড়িতে নির্মলদার সঙ্গে বেশি কথা বলিনি, মাস্টারদার সঙ্গেই বলেছিলাম। নির্মলদা শুধু বলেছিলেন, "বাড়িতে কি বলে এলে।" কয়দিন থাকবে? ইত্যাদি।

তারপর বললেন, মাস্টারদার সাথে কথা বল। এই মানুষটি অতল, এঁর তল পাবে না! আমাদের মতো মানুষ ঢের পাবে, কিন্তু এঁর মতো পাবে না। আমি ওকে বলেছি তুমি খুব Intelligent, দেখি কতখানি Move করতে পার। আমার ভয়ানক লজ্জা করতে লাগল, কারণ আমি ভালো করেই জানি যে আমি Intelligent নই। কিন্তু উল্টো চাপ দিয়ে বললাম,Intelligent দেখাবার এমন কি একটা সুযোগ দিয়েছিলেন যে বলছেন? তা ছাড়া আমি একটা মস্ত বোকা। মাস্টারদা যখন আমার সঙ্গে কথা বলে বললেন যে, আমার বুদ্ধি নাই, তখন আপনি খুব জব্দ হবেন। শুনে হাসতে লাগলেন। তারপর মাস্টারদার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে খেতে গেলাম। আমি নির্মলদার সঙ্গে খেলাম।

খুব ভোরে নির্মলদা এসে আমাকে দোতলায় ডেকে নিয়ে গেলেন। সামান্য বাজে কথাবার্তা বলার পর আমার হাতে মেশিনটা দিলেন। Trigger টিপতে পারছি না দেখে মুখে হতাশ হলেন না, বরং আমাকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছিল আর বললাম, একেই তো মেয়েলোক লক্ষ্মীছাড়া, তারপর হাতটা আরো লক্ষ্মীছাড়া– আমার আঙ্গুলটাকে পিটিয়ে ঠিক করে দিন। আমাকে নিরুৎসাহ হতে দেখে বললেন, "নিরাশ হয়ো না, তিন দিনে সব ঠিক করে দেব" যদি আরো আগে তোমাদের পেতাম তবে অনন্তলালের হাতে তুলে দিতাম।" এই বলে অনন্তলালের কথা বলতে লাগলেন। বললেন, অনন্ত একজন Born revolutionist- ভারি সুন্দর, সুখেন্দুর (সুখেন্দু বিকাশ দত্ত) মৃত্যুর পর যখন আমরা মিটিং করি তখন একেবারে চটে গিয়ে বলেছিলেন, "এ সব করে কী হবে?" বুকের রক্ত যেদিন দিতে পারব, সেদিনই এর প্রতিকার হবে।" তারপর বললেন, "তোমাদের অনন্তলালকে ভালো লাগত না।" খুব আশ্চর্য লাগল। বিশেষ কিছু না বলে শুধু বললাম, কে বলল আপনাকে? আমি তো বহুদিন ধরেই তাঁকে Indian Nepolean ভেবে শ্রদ্ধা করে আসছি। আরো কিছুক্ষণ মেশিনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম। কয়েকটা যুযুৎসুও শিখিয়ে দিলেন।

এক একটা সাধারণ কথা শুনে নির্মলদা কী রকম প্রাণ খুলে হাসতেন, আমি দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। ভাবলাম, এদের দুঃখ সইবার শক্তি যেমন অসীম, সত্যিকার আনন্দ উপভোগ করতে কেবল এরাই জানে।

নির্মলদার মধ্যে আমি এ জিনিসটা এত বেশি দেখতাম যে, অবাক হয়ে যেতাম। আমি আর রমণ ঘোমটা দিয়ে কী ভাবে এসেছিলাম, একটা মুসলমানী মেয়েলোককে কী কী বলেছিলাম এসব গল্প বলছিলাম আর মহোৎসাহে

শুনছিলেন। একবার বলছিলেন, ‘তোমাদের দু-জনকে একসঙ্গে দেখার বড় ইচ্ছা ছিল। দেখি তোমরা কী কর, কিন্তু দেখলাম না।” যাঁদের ভেতরটা সুন্দর, তাঁরাই এমনি করে জগতের সব কিছুর থেকেই সৌন্দর্য গ্রহণ করে থাকে।

তারপর আমাকে রামকৃষ্ণদার কথা বলতে বললেন, আর আমি অনর্গল বলে যেতে লাগলাম। বললেন, “তুমি রামকৃষ্ণের কথা বল তখন মনে হয় যেন গল্প শুনছি– আমার প্রতি রামকৃষ্ণের খুব Regard ছিল। আমি যে ধূর্ত তা সে জানত। তাই বলেছিল যে, সবার শেষে ধরা পড়ব। সত্যি ও যে কত বড় আগে বুঝিনি। একটা জিনিস আমি লক্ষ করতাম যে, ও যখন কাউকে প্রণাম করত মাথাটা খাড়া থাকত।” বলতে বলতে নির্মলদার চোখের কোণে জল দেখা দিল, দেখে আমার বুক ফেটে কান্না এল। এদের চোখে জল দেখা সেও বহু জন্মের পুণ্যের কথা কেন না এ অশ্রুজল মর্ত্তের নয়– স্বর্গের। তারপর আমি নির্মলদার মুখে রামকৃষ্ণদার কথা শুনতে লাগলাম।

ওর নাকি নিরামিষ খেতে একটুও ভালো লাগত না। রোজই খেয়ে উঠে কাশত আর নির্মলদা বলতেন, “কী যে খেয়ে উঠে কাশতে আরম্ভ কর।”

এরপর খেয়ে উঠেই নাকি রামকৃষ্ণদা বলত, “নির্মলদা একবার কাশব, শুধু একটি বার।” নির্মলদার মুখে রামকৃষ্ণদার কথা শুনতে আমার বড়ই ভালো লাগত, তিনিও খুব আগ্রহভরে বলতেন।

রামকৃষ্ণদাকে কয়েদিবেশে কারাগারে প্রথম দেখেছিলাম এবং সেখান থেকেই সে বিদায় নিলেন। ওর জীবনের এদিকটা আমার কাছে নিতান্তই অজানা ছিল। নির্মলদার কথা শুনতে শুনতে আমি রামকৃষ্ণদাকে আমাদের মাঝখানে কল্পনা করতাম আর মনটি ব্যথায় ভরে উঠত।

খাওয়া দাওয়ার পর সবাই একটু ঘোরাফেরা করতে লাগলাম। নির্মলদা একটু পরে ওপরে যেতে বলে চলে গেলেন– আমি গিয়ে দেখি দু’তিনটি মানিব্যাগ খুলে টাকা গুণতে বসেছেন। আমাকে পাশে বসতে বললেন। মাস্টারদা ব্যাগ থেকে কতকগুলি সিকি আর গিনি দেখিয়ে বললেন, “এই দেখ এগুলি হারালে অমঙ্গল হবে।” বলে হাসতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের টাকা আলাদা আলাদা থাকে বুঝি? “হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, মাস্টারদা কারো কাছে চান না। মাস্টারদার কাছে সবসময় এক হাজার টাকা থাকা দরকার। ওঁকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এক এক সময় টাকা পয়সার চিন্তায় আমার ঘুম হয় না– আর

মাস্টারদা শোয়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়েন ঠিক একটি ছোট ছেলের মতো। আমার ভারি চমৎকার লাগে।”

এসব কথা হচ্ছে, এমন সময় মাস্টারদা নীচে থেকে এলেন। ওঁরা দু'জনে অন্য ঘরে গিয়ে কথা বলতে লাগলেন। একটু পরে দেখি, নির্মলদা ওই দিন দুপুরে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। আমাকে দেখে বললেন, “দেখ আমাদের সাহস কম নয়, দিনের বেলা বের হচ্ছি।” বললাম তা তো দেখছিই, দুনিয়াতে আপনারা কি-ই বা না পারেন? কিন্তু আমার তো ভয় করছে।

কোমরে মেশিন ও যুদ্ধ Belt-টি বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন চোখে খুব সুন্দর লেগেছিল, বাঙালি বীরের এই অসাধারণ যোদ্ধার বেশ ভারি নতুন লাগল।

সন্ধ্যার একটু পরে নির্মলদা ফিরে এলেন। তখন জালালাবাদ কাহিনীর একটু বর্ণনা দিয়ে বললেন, স্বর্গের দেবতাগণ হয়তো সেদিন এই লীলা দেখাবার জন্য একত্র হয়ে গিয়েছিলেন। রাত্রিবেলা Targeting-এ বের হলাম। জ্যোৎস্নাদেবী অতি সন্তর্পণে তাঁর রূপালী আঁচল খানি পৃথিবীর বক্ষে পেতে রেখেছিলেন। আমি যখন Male dress নিয়ে নির্মলদার সামনে এসে দাঁড়ালাম– কী ভীষণ হাসতে লাগলেন, আর বললেন, “তোমাকে দেখে আর মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে না। একটি ছোট ছেলের মতো লাগছে।” আমি বললাম, তাই নাকি? তবে আমি তোমার ছোট ভাই। হাসতে হাসতে বললেন, “আমার তো তাই মনে হচ্ছে।” আমরা পাঁচজন ছিলাম। কে যেন বললে– পঞ্চপা-বের মতো লাগছে। নির্মলদা বললেন, “তুমি সহদেব।” না, আমার অর্জুন হতে ইচ্ছে আর আপনি তো ভীম। যখন মাঠের উপর দিয়ে চলেছি নির্মলদা বলেছিলেন, Absconding life-এ এরকম অভিযান আর হয়নি। আজকের তারিখটা লিখে রেখো। মনে হচ্ছে যেন যাবার আগে দুনিয়ার সব সুখ লুটে নিয়ে যাচ্ছি।” একথাটা আমার বড়ই ভালো লেগেছিল।

ফিরবার পথে মাঠের মাঝখানে দু'জনে বসলাম। আমাকে একটা গান করবার জন্য খুব সাদাসাদি করতে লাগলেন। বললাম, পারব না। যা তা হবে। লক্ষ্মীটি আমাকে সাধবেন না, শেষকালে আমার কষ্ট হবে। লক্ষ্মীটি বললাম বলে খুব হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, “আচ্ছা দেখি, তুমি কেমন দৌড়তে পার। একটি দৌড় দাও তো।” আমার খুব মজা লাগল কারণ দৌড়াতে খুব ভালোই পারি। দৌড়ে অনেকখানি গিয়ে যখন ফিরে এলাম, বললেন, ‘বাঃ। বেশ তো দৌড়াতে পার, Action করার সময় এ রকম দৌড়াতে পারবে তো?” তারপর বললেন, “তুমি আত্মীয়স্বজন সবাইকে ছেড়ে

কোথায় চলে এসেছ! আমরা এখানে তোমাকে মেরে ফেললেও কেউ টের পাবে না।" বললাম, সে অধিকার তো আপনাদের আছেই। আপনাদের কাছে তো নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আপনারাই তো নিচ্ছেন না। কেবল আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে চান। বললেন, "তোমাদের কীসের জন্য মারব? মারব না।"

যখন ফিরলাম, তখন প্রায় ভোর হয়ে গেছে। সেদিনকার সেই অভিযান আমার জীবন-খাতার একটি বৃহৎ শূন্য পাতা পূর্ণ করে দিয়েছে। যদিও একটি মাত্র গুলি লাগাতে পেরেছিলাম বলে এক একবার খুব খারাপ লাগছিল, তবুও গুলি করেছিলাম বলেই খুব মজা লাগছিল। আজও যখন সেদিনের কথা মনে হয়, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি নির্মলদার সাথে Targeting-এ যাওয়ার যে সৌভাগ্য আমার হয়েছিল আমি যেন তার যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করতে পারি।

পরের দিন সকালবেলা অনেকক্ষণ মাস্টারদার সঙ্গে কথা বললাম। দুপুরবেলা নির্মলদার কাছে গেলাম। তখন বলেছিলেন, "No revolutionary can die with satisfaction". ওটা খুব ঠিক কথা। অনেক কিছু করা হলো না, ভেবেই তারা সারা।

সেদিন বিকেলেই আমার ফিরে আসার কথা। নির্মলদা বললেন, "তুমি চলে যাবে বলে আমার খারাপ লাগছে। আমিও এখান থেকে চলে যাব। মাস্টারদাকে একা একা রেখে যেতেও প্রাণ কাঁদে।" বললাম, একেবারে রেখে দিন না। আমারও যেতে ইচ্ছে করছে না। হাসতে হাসতে বললেন, "আমি মত দিলাম, এবার মাস্টারদার মত লও"।

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সোনার বরণী রাণী গো... গানটা জানিস? আমাদের দলে তিনটি রাণী আছে Of which you are the eldest."

আমি বললাম Of which আমি হলাম লোহার বরণী রাণী আর রমণ হলো সোনার বরণী রাণী।

শুনে কি প্রাণমাতানো হাসিই না হেসেছিলেন। বললেন, "লোহার বরণী রাণীকেই তো আমার বেশি সুন্দর লাগে," আমি ভীষণ হাসতে লাগলাম। নির্মলদাও হাসলেন।

তারপর বললেন, "একদিন হয় তো দেখবি যে দোকান সাজিয়ে দোকানদার হয়ে বসে আছি। যেখানেই থাকি না কেন তোদের খবর নেব। আমি যদি ধরা পড়ি, তবে তুই আর রমণ মাঝে মাঝে লালদিঘির পাড়ে একটু দেখা দিস।"

অদৃষ্টের গতি একেবারে অন্যদিকে গেল। নির্মলদার আমাদের খবর নিতে হলো না, আমাদেরও দেখা দিতে হলো না।

সেদিন বলেছিলেন, "এখন আমাদের অবস্থা হচ্ছে One foot in grave. পৃথিবীর উপর সবাই এমনিভাবেই চলবে, থাকব না শুধু আমরা।"

নির্মলদার কথাগুলো হৃদয়ের সবটুকু দরদ দিয়ে অনুভব করেছিলাম। কিন্তু সেদিন তো ভাবিনি যে, তাঁর কথামতো এত শীঘ্রই তিনি যাবেন। সত্যই তো আজ পৃথিবীর উপর জীবনের স্পন্দন তেমনিভাবেই হচ্ছে– কর্মের অবিরাম প্রবাহ বিশ্বের বুকে বিচিত্র ভঙ্গিমায় তেমনিভাবেই চলেছে– কিন্তু নির্মলদা তাঁর কাজ শেষ করে চলে গেছেন।

ক্রমে আমার আসার সময় হলো। আসবার সময় যখন নির্মলদাকে প্রণাম করতে গেলাম, বললেন, "আমাকে আর কোনোদিনও প্রণাম করো না।" বললাম, আচ্ছা, আপনি এমনি প্রণাম করতে না দিলে কী হবে? মনে মনে করলে তো আর আটকাতে পারবেন না।

একটা কাগজে বেঁধে আমাকে আশীর্বাদ দিলেন। মাস্টারদা বললেন, 'এগুলো Preserve করো।" কি আনন্দের সঙ্গেই না এই আদেশ মাথায় নিয়েছিলাম।

ওঁদের আশীর্বাদ মাথায় করে ও ওঁদের দেওয়া শক্তি বুকে ধরে সেদিন ঘরে ফিরলাম।

কিছুদিন পর আবার আমার ডাক পড়ল। সেদিন রওনা হওয়ার কথা। সকাল থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল।

সকাল বেলা আমার কাছে একবার খবর দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোনো খবর না দেওয়ায় ভয়ানক ব্যস্ত হলাম। ভাবলাম যদি বৃষ্টির জন্য আমাকে না নেন, তবে খুব বকে দেব। আবার ভাবলাম, হয়তো Situation খুব খারাপ হয়ে গেছে। বাসায় বলে রেখেছিলাম, 'সীতাকু-' যাব। মাকে বললাম– বন্ধুদের জন্য কিছু খাবার করে দাও। দুপুর শেষ হয়ে গেল, তবুও কেউ যাচ্ছে না দেখে মাকে বললাম– নষ্ট হয়ে যেতে পারে এরূপ কিছু করো না। কাপড়-চোপড় ঠিক করে রাখলাম– তারপর কেবল ঘর-বার করতে লাগলাম।

প্রায় ৫টার সময় লোক গেল। কী উৎসাহ নিয়েই না সেদিন রওনা হয়েছিলাম– নির্মলদার সঙ্গে সেই শেষ দেখা করতে আসছি বলেই তো সেদিন এত উৎসাহ নিয়ে এসেছিলাম। উৎসাহ সব সময়ই তো থাকে, কিন্তু এবার যেন একটা অভিনব অনুভূতিতে মনটা ভরে গিয়েছিল।

সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় যখন কর্দমাক্ত গ্রাম্য পথ দিয়ে চলেছি। ভাবলাম এরকম কাদা মাড়াবার সুযোগ জীবনে আর ক'বার মিলবে কে জানে।

গন্তব্যস্থানে যখন গিয়ে পৌঁছলাম– একটা অফুরন্ত উচ্ছল হাসির শব্দ আমার কানে গেল। নির্মলদা বললেন, "এই হলো অপূর্ব সেন, যার সঙ্গে রামকৃষ্ণ তোমাকে আলাপ করতে বলেছিল।" চোখে দেখলাম, একখানা সহাস্য কচি মুখ, অন্তরের সরলতা যেন মুখখানাতে ফুটে উঠেছিল।

আমি যে খাবারের টিনটা নিয়েছিলাম, মাস্টারদা সেটা থেকে একটা নারকেলের সন্দেশ বের করে খেলেন। দেখে আমার খুব আনন্দ হলো।

আমি ঘরের মধ্যে রইলাম, আর সবাই বারান্দায় খেতে বসে গেলেন। নির্মলদা এক একবার ভেতরে ঢুকে আমার ভাগেরটা দিয়ে আসতে লাগলেন। তার আশীর্বাদ আমার মাথায় যখন সস্নেহে বুলিয়ে দিচ্ছিলেন– ভাবলাম, স্নেহ বিলাতেও বুঝি কেবল এঁরাই জানেন।

রাত্রিরে আর বেশি কথাবার্তা হলো না, মাস্টারদা, নির্মলদা দু'জনই বের হয়ে গেলেন। নির্মলদাকে বললাম, আমাকে নিয়ে যাবেন না? বললেন, "আর একদিন নেব।"

আমি নীচে মহিলার পাশে শুয়ে রইলাম, ছাদে কেবলই মচ মচ শব্দ হচ্ছিল আর হাসির ফোয়ারা ছুটছিল। মহিলা আমার কাছে নালিশ করছিল, একটা ছেলে এসেছে কেবলই হাসে আর 'ভালো লাগে' বলে এমন একটা টান দেয় যে আর থামে না। শুনে ভোলার (অপূর্ব সেনের) প্রতি গভীর স্নেহে আমার মনটা ভরে গেল।

সকালবেলা ভোলা নীচে থেকে খাবারের টিনটা নিয়ে এল। আমি তখন অন্য ঘরে নির্মলদার কাছে বসেছিলাম। টিনটা হাতে নিয়ে ভোলা খুব হাসছিল। তারপর কি মাতামাতি করেই না সবাই মিলে খেতে লাগলেন। এঁদের খাইয়ে তৃপ্তি আছে।

নির্মলদাকে বললাম, আমি এসে অবধি কেবল ওর হাসিই শুনছি, হাসিটা আমার ভারি সুন্দর লাগছে। তিনি তখন বললেন, "ছেলেটা ভারি Jolly আর Sincere-Comic করতে জানে। ওর কাছে থাকলে আমিও হাসি থামাতে পারি না। সম্প্রতি Absconder-দের মধ্যে ও হলো Best Production-এ রকমের ছেলে দু'একটা থাকলে দেশ আলো করে রাখতে পারবে।"

নির্মলদার কথা শুনে কেবলই মনে হচ্ছিল এই সেই অপূর্ব সেন। রামকৃষ্ণদা

শুধু তার নামটা করেছিল: ভাবলাম নির্মলদাকে বলি, ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে, কারণ রামকৃষ্ণদা বলে দিয়েছে। বলা আর হলো না।

সেদিন সারাটা দিন নির্মলদা আমাকে Machine training দিলেন। কী করে কাপড়ের মধ্যে লুকোব, হঠাৎ বের করব– অরসরহম ইত্যাদি সব শিখিয়ে দিতে লাগলেন। এবার নির্মলদা আমাকে মধ্যের আঙ্গুল দিয়েই Practice করালেন আর বললেন, "তোকে এই আঙ্গুল দিয়েই Action করতে হবে। এই Secret-টি কাউকে বলে দিস না, শুধু আমরা জানব। তারপর Action হয়ে গেল সবাই জানবে।" আমার খুব আনন্দ হলো। বললাম আগেরবার যখন পারছিলাম না, তখন কেবল এই আঙ্গুল দিয়ে Practice করলাম না? নির্মলদা হাসতে হাসতে বললেন, "তখন তো মাথায় আসেনি।"

তারপর দুজনে গল্প করতে বসলাম। তখন বিকেল হয়েছে। নির্মলদা কয়েকজন ছেলের নাম করে বললেন, "এরা সব সময় একসঙ্গে চলত, সদরঘাট এরাই আলো করে রেখেছিল। আনন্দ, রজত, ত্রিপুরা ও টেগরাকে আমরা টুলু, টান্টু, টুনু ও টেগরা বলে ডাকতাম। এতগুলিকে মেরে ফেলেছি আর ভালো লাগছে না।" ভগবান বোধ হয় অন্তরীক্ষ থেকে এই কথা শুনেছিলেন। তাই আর দেরি না করে নির্মলদাকে কেবল কোলে তুলে নিলেন।

নির্মলদা যখন এইসব ছেলেদের কথা বলছিলেন, তখন আমি বললাম, সত্যি চাঁটগার ওপর যে কা-টা হয়ে গেল তার পিছনে যে কত সুন্দর ইতিহাস রয়ে গেছে তার খবর কয়জন রাখে? আমার কথা শুনে বললেন, "তোমার কাছে পা-িত্য ও ছেলেমানুষি দুটোই আছে, এটা আমার খুব চমৎকার, তার কাছে সবই চমৎকার লাগে।" নির্মলদার এই 'চমৎকার' কথাটিও চিরদিন আমার মনে থাকবে। কথায় কথায় শুধু 'চমৎকার' বলতেন। ভাবতাম যে নিজে চমৎকার তার কাছে সবই চমৎকার লাগে। আমি নির্মলদাকে বললাম, এই ছেলেটিকে আমার খুব ভালো লাগে। তখন বললেন, "মাস্টারদা ওকে খুব আদর করেন– আমাকে আজকাল আদর করেন না। আমি বড় হয়ে গেছি, আমি যে বুড়ো হয়ে গেছি সে কথা আমার মনেই থাকে না।" আয়না দেখলে মনে পড়ে, শিশুর মতো সরল ও পবিত্র প্রাণ যাদের তাদের আবার কীসের বার্ধক্য?

ক্রমে সন্ধ্যে হয়ে গেল। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল বলে খিচুড়ি রান্নার প্রস্তাব হলো এবং রান্নার ভার আমার উপর পড়ল। শুধু খিচুড়িটা রান্না হলেই সবাই মিলে একটা থালা করে খেতে বসে গেল। মহিলাটিকে বলছিল বেশি করে দেবার জন্য। ভাজাগুলো তখনও হয়নি বলে আমি নিষেধ করলাম। খাবার সময় ভোলার

হাসি তেমনিভাবেই চলছিল। নির্মলদা খিচুড়ি খেয়ে এসে আমাকে বললেন, “খিচুড়িটা খুব ভালো হয়েছেঃ রান্না করতে কবে শিখলে। তোমাদের হাতে নিশ্চয়ই অন্নপূর্ণা আছেন।” বললাম হ্যাঁ, আমাদের হাতে অন্নপূর্ণা আর আপনাদের হাতে বিশ্বকর্মা। খুব হাসতে লাগলেন।

আমি যখন আলুভাজা করছি, ভোলা একটি কাগজ নিয়ে আমার কাছে বসে রইল আর বলল, “দিদি, ও must-take আলুভাজা।” অল্প করে দিলাম আর চাইলে পর বললাম, আর দেব না, খিচুড়ি খাওয়া হবে কি করে? আলুভাজা খেয়ে পেঁয়াজভাজাটা খাওয়ার জন্য বসে রইল। আমাকে ডিম ভাজার জন্য কাঁচালঙ্কা কেটে দিল।

নির্মলদা দূর থেকে এসব লক্ষ করছিলেন, “ভোলা যখন তোমার সঙ্গে কথা বলছিল আমার দেখে খুব ভালো লেগেছিল।” আজ ভাবছি, যাবার আগে নির্মলদা পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণার সৌন্দর্য উপভোগ করে গেলেন। দু’জনে একসঙ্গে যাবে বলেই হয়তো এমন করে একজন আর একজনকে প্রাণ ভরে দেখে নিল।

রান্না হবার পর সবাই মিলে খেতে বসলাম। কেউ বেশি খেতে পারল না। পাতেই অনেক রয়ে গেল। ভোলা মহোৎসবে বলতে লাগল, “আমি কাগজ বেঁধে সব রেখে দেব আর সকালবেলা খাব। Excellent হবে।” খাওয়া-দাওয়ার পর নির্মলদা নিজের ঘরের মধ্যে শুয়ে রইলেন। ঝুম ঝুম বৃষ্টি পড়ছিল। আমাকে ডেকে বললেন– “তোর রান্না খেলাম, এবার তোর একটা গান শোনা।”

চির অভ্যাসমত আমি কিছুতেই গান করলাম না। যদি জানতাম যে, নির্মলদা এ জীবনে আর সাধতে আসবেন না তবে সে দিন যা হয় একটা গেয়ে দিতাম। আমি জানতামই যে মৃত্যু প্রতি মুহূর্তেই এঁদের জন্য অপেক্ষা করছে। গান করিনি বলে আমার খুব খারাপ লাগল আর বললাম, “দোহাই আপনার, আমাকে সাধবেন না। ইতিমধ্যে বের হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে মাস্টারদা ওপর থেকে নেমে এলেন। নির্মলদাও উঠে কাপড়-চোপড় পরে নিলেন। অবিরল ধারায় বৃষ্টি পড়ছিল। নির্মলদা যখন একটা ছাতা মাথায় দিয়ে উঠানে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি বললাম, আমাকে নিয়ে যান। বললেন, “আচ্ছা চল, এসো আমার ছাতার নীচে এসে দাঁড়াও।” বললাম দাঁড়ালে কী হবে? শেষকালে তো তাড়িয়ে দেবেন।

রাত্রির অন্ধকারে বারিধারা মাথায় করে রওনা হলেন। আমি সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ নেত্রে দেখতে লাগলাম; ভাবলাম, কবি নিশ্চয়ই এই আপনভোলা ছন্নছাড়া বিপ্লবীদের হয়েই বলেছেন :

“কেবল তব মুখপানে চাহিয়া

বাহির হ'নু তিমির রাতে

তরুণীখানি বাহিয়া।”

পরের দিন সকালবেলা (অর্থাৎ ১৩জুন, সোমবার) আমি যখন গেলাম সবাই তখন ঘুমাচ্ছেন। মাস্টারদা আমাকে নির্মলদা যেই ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন সেখানে বসতে বললেন। নির্মলদা ঘুমাচ্ছিলেন, আমি চুপ করে বসে রইলাম। অনেকক্ষণ পরে নির্মলদা ঘুম থেকে জেগে উঠে বললেন, “তুমি যে কখন গোপনে এসে বসে আছ টেরই পাইনি।”

Zvici ej‡Z jvM‡jb :

“সে যে পাশে এসে বসেছিল

তবু জাগিনি–

কি ঘুম তোরে পেয়েছিল

হতভাগিনী।”

শুনে আমি খুব হাসতে লাগলাম, নির্মলদাও হাসতে লাগলেন। আমি বললাম, বাঃ! Poetry-তে কথা বলতে আরম্ভ করলেন দেখছি। আমরা ক্লাসে বসে কি রকম Poetry লিখতাম, জানেন?

“রাগ করেছিল ছেলেমানুষ

দেখবি ফিরে উড়বে ফানুস

কিম্বা খাবি লজঞ্চুস।”

হাসতে হাসতে বললেন, “তোমরা তো ভয়ানক দুষ্টুদেখছি। মেয়েরা যে এত দুষ্টু হয় জানতাম না। আমার বড় দুঃখ রইল তোমাকে আর রমণকে একসঙ্গে দেখলাম না।”

সেদিন যে সমস্ত কথা বলেছিলাম মনে হয় নির্মলদা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর যা কিছু বলার আছে সেইদিনই বলে নিতে হবে, আর বলা হবে না। বললেন, “রমণের সঙ্গে আর দেখা হবে না। ওকে বলো, আমার উপর রাগ না

করতে। তুমি আরো একত্র হবে, তোমরা দুজনের কথা দুজনকে সব বলতে পার। আমার কোনো আপত্তি নেই। আমার মনে হচ্ছে Destiny-র Against-এ কেউ যেতে পারে না, আমরা যতই করি না কেন, অবশেষে Destiny-র কাছে হার মানতেই হয়।"

তারপর বললেন, "রামকৃষ্ণদার একটা কথা আজ তোকে বলব। আমাদের Absconding life-এ কতরকম ইতিহাস যে নিহিত আছে, তা কেউ জানে না। রামকৃষ্ণদার Organise করা একটি ছেলে Absconding life-এ কীভাবে মারা গেল, কীভাবে ওর সৎকার করা হলো, রামকৃষ্ণদার মনে কী রকম লেগেছিল, একটি মহাপ্রাণ এমনি করে গোপনে ঝরে গেল– একই পথের পথিক প্রিয় বন্ধুগণ ছাড়া আর কেউ জানল না।"

তখন বললেন, "রামকৃষ্ণদা যখনই খুব গম্ভীর হয়ে থাকত আমরা তখন ওকে ফুইট্যাদার (তারকেশ্বর দস্তিদার) কাছে পাঠিয়ে দিতাম। ও নিজে কিছুই বলতো না। ফুইট্যাদাকে ও ভালোবাসত এবং খুব Respect করত।"

রামকৃষ্ণদাকে Plan Chet-এ ডাকার কথা বলে বললেন, "তুই আর মাস্টারদা আনিস– আমি নয়, আমার ভয় করে, যদি কিছু না করে বসে আছি বলে বকে দেয়।"

আশ্চর্য এবার মাস্টারদার সঙ্গে এই দুইদিন ধরে মোটেই কথা বলিনি। সারাক্ষণই কেবল নির্মলদার কাছে বসেছিলাম। নির্মলদার সঙ্গে এই জীবনে আর কথা বলতে হবে না হয়তো এরকম হয়েছিল। সেদিন সকালবেলা ভোলার জ্বর এসেছিল। জ্বরসুদ্ধ সারাদিন Comic করেছে। এই আনন্দের উৎসটিকে যতই দেখছিলাম ততই যেন মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম।

নির্মলদা বললেন, "ভোলা হলো মাস্টারদার Assistant, ও বেশ ইংলিশ জানে। যা কিছু লেখা হয়, মাস্টারদা ওকে দিয়ে পড়ান।" তারপর বকে যেতে লাগলেন, "ভোলা এর মধ্যে একদিন বাড়ি গিয়েছিল। বাড়িতে ওর সাতজন বৌদি আছে। বাড়িতে বৌদিদের বলেছিল, "তোমরা সবাই Fall-in কর; আমি Command করছি। ছেলেপিলে সবগুলিকে জাগিয়ে দিয়েছিলাম।" শুনে আমার ভারি সুন্দর লেগেছিল। আজ ভাবছি– এ রকম করে বিদায় নেওয়াটা বুঝি ওকেই সাজে, যাবার আগে একবার বাড়ি গিয়ে সবাইকে চমক লাগিয়ে ফিরে এল।

নির্মলদা আর একটু ঘুমিয়ে নিলেন। জেগে উঠে বললেন, "দেখ আগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করতাম। এখন যেন Brain-এ কিছুই নেই বলে মনে হয়।

মাঝে মাঝে ক্রমাগত তিন চারদিন শুয়ে থাকতাম আর কাঁদতাম। লোকে বলত, এটার হলো কি?"

এই কথাগুলো যে নির্মলদার কতখানি পরিচয় দিচ্ছিল শুধু তাই ভাবছিলাম। জগতের লোক মনে করে বিপ্লবীরা একটা নেশার ঝোঁকে কেবল মারামারি কাটাকাটিই করতে জানে, কিন্তু ওদের ভেতর যে কি বিপুল ঐশ্বর্য্যের ভা-ার আছে তা খোঁজ পাওয়ার সৌভাগ্য কয়জনেরই বা হয়। আর নির্মলদার উদ্দেশ্যে আমার অন্তরে বিশ্বকবির সেই গানটাই কেবল মনে হচ্ছিল :

"কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ

জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস,

সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,

পাগল ওগো, ধরায় আস।"

আমাকে একবার একটু অন্যমনস্ক দেখে বলেছিলেন, "তুমি এখন জীবন-নদীর এপারে, নাওপারে? জান, আমরা নদীর পারে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করতাম, "এই জীবন নদীর এপারে থাকবি, নাওপারে যাবি?" আজ ভাবছি, ইহলোক থেকে বিদায় নেবার আগে বুঝি লোকের মুখ দিয়ে এরকম কথাই বের হয়। আমি বলছিলাম, আপনারা যাবার আগে আমাদের দিয়ে কিছু করিয়ে যান। বললেন, "আমরা চলে গেলেও করতে পারবে। কিন্তু আমরাও মাঝে মাঝে স্বার্থপরের মতো মনে করি যে, আমরা না করলে চলবে না। মাস্টারদার শেষ কাজটা বাকি রয়েছে এবং সেটা হচ্ছে Female action আমি বললাম, আমার বড় মরতে ইচ্ছা করছে। চন্দননগরে সুহাসিনী দি একটা Great chance হারিয়েছিল। এখানে যদি পুলিশ আসে আমি আপনার কাছ থেকে নড়ব না। নির্মলদা বললেন, "কিসের জন্য মরবি?" কে জানত যে কয়েক ঘণ্টা পরেই মৃত্যু এসে হাজির হবে আর নির্মলদাকে কোলে তুলে নেবে– আমাকে স্পর্শও করবে না।

তারপর আমাকে বললেন, "পিঠে হাত বুলিয়ে আমায় শান্তি দে।" আমি পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, আমি শান্তি দেব না নেব। বললেন, "আমি আরেক জন্মে তোমার বোন হয়ে জন্মাব।" আমি বললাম, আমি আরেক জন্মে লক্ষ্মীছাড়া মেয়েলোক হব না।

এমনি করেই নির্মলদা যাবার আগে সব কিছুই বলে গেলেন। আমাকে ভোলার জন্য সাগু জ্বাল দিতে নীচে পাঠিয়ে দিলেন। আমি যখন সাগু রান্না করছি,

ভোলা তখন ঘরের ভেতর গুনগুন করে গান করছিল। সাগুটা ঠা-া করে লেবু আর চিনি মিশিয়ে ভোলাকে খাওয়ালাম। জীবনের শেষ খাওয়া খেয়ে নিল।

ভগবান আমাকে অনেক দিয়েছেন। স্মৃতির বোঝা আর ভারী না করলে খুশিই হব এবং করলেও অনুযোগ দেব না। তারপর ভাত খাওয়ার ডাক পড়ল। নির্মলদা ভাত খাবেন না বলে দিয়েছিলেন। আমি বরাবর নির্মলদার সঙ্গে খেতাম। মাস্টারদার সঙ্গে ভাত দিয়েছে দেখে এক দৌড়ে উপরে চলে গেলাম। নির্মলদা একা চুপ করে শুয়েছিলেন, না জানি তিনি তখন কোন অমরলোকের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন।

আমি বললাম মাস্টারদার সামনে খেতে লজ্জা করছে বলে আমি পালিয়েছি, পালিয়েছি বলে আরো লজ্জা করছে। মাস্টারদা নিশ্চয় টের পেয়েছেন। নির্মলদা হাসতে হাসতে বললেন, "তাতে কিছু হবে না।" এমন সময় মাস্টারদা বিদ্যুদ্বেগে ছুটে এসে বললেন, "পুলিশ এসেছে, পুলিশ এসেছে।" ভাবলাম, এই মুহূর্তেই তো সব শেষ হয়ে যাবে। ওঁদের বললাম, আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব। কিন্তু আমায় থাকতে দিলেন না– মই বেয়ে নীচে নেমে যেতে বললেন। কথামতো নেমে গেলাম।

দুই দিক থেকে গুলি চালাচালি হতে লাগল। কয়েকটা জয়ধ্বনিও আমার কানে গেল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ হবার পর নির্মলদার আর্তনাদ শুনতে পেলাম। শোনামাত্র উপরে উঠতে গেলাম আর তিনজন মিলে আমাকে চেপে ধরল। ওদিকে কি করুণ সুরেই না আমার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। ওপরে ওঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম। ওদের কত ভয় দেখালাম, চোখ রাঙালাম। ছোট মেয়েটিকে একটি ঘুষি দিলাম। কিছুতেই আমায় ছাড়ল না। তারপর বললাম, আচ্ছা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাব না। তবু ছাড়ল না। একবার মইয়ের প্রায় অর্ধেক যেতে পেরেছিলাম– টান দিয়ে আমাকে ফেলে দিল। নির্মলদার ডাক আমার সহ্য হচ্ছিল না। নির্মলদার কাছে যদি একটিবার যেতে পারতাম, জানি না আমায় কী বলতেন; কিন্তু আমার নাম ধরে যে এতবার ডাকলেন এর চাইতে বেশি আর কি চাই?

ভগবান আমাকে একটিবার নির্মলদাকে দেখে আসতে দিলেন না। এই ব্যর্থতা আমার বুকে প্রতিনিয়ত শেলের মতো বেঁধে– ধৈর্যের বাঁধ একেবারে ভেঙে দিতে চায়। এমন সময় মাস্টারদা ও ভোলা নীচে নেমে এলেন। দেখে বড়ই আনন্দ হলো। এতক্ষণ ওঁদের কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে একবার মনে হয়েছিল তাঁরাও নেই। মাস্টারদা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তোকে এখন কোথায় নিয়ে যাব... তোর Life-টাও নষ্ট করলাম।" মাস্টারদার পায়ে ধরে বললাম, আমি আপনাদের সঙ্গে যাব। আমি তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে,

মাস্টারদার সঙ্গ ছাড়ব না। চোখের একটি মাত্র পলকে ভোলাকে দেখেছিলাম। কি চমৎকার লেগেছিল। মুখে এতটুকু চাঞ্চল্যের ভাব নেই। বীরের মতো বুক ফুলিয়ে মাস্টারদার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তিনজন রওনা হলাম। ভোলা আগে আগে ছিল। সম্মুখে মৃত্যু এই বীর ভাইটিকে গ্রাস করবার জন্য তার লেলিহান জিহ্বা বের করেছিল। আর সে বীরদর্পে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুভদ্রার অভিমন্যু সহস্রভেদী বাণ খেয়ে নিঃশেষে প্রাণ বিসর্জন দিল।

মাস্টারদা দু'টি রত্ন হারিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন। মাস্টারদার সঙ্গে আমি চলে এলাম। আমার জীবন ধন্য হলো। না– মাস্টারদার নাম উল্লেখ করে আর কাজ নেই। মাস্টারদার যে পরিচয় সেদিন পেয়েছিলাম এখন তা লিখতে বসে আমি তাঁকে ছোট করে দেব না।

রামকৃষ্ণদা বলেছিলেন, "ভোলার সাথে আলাপ করতে। আলাপ চূড়ান্ত হয়ে গেল। দু'দিন ধরে শুধু ওর হাসিই শুনেছিলাম। সবশেষে, আমার'ই দু-চোখের সামনে সে মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নির্মলদা অতি অল্প দিনেই অনেকখানি আপন করে নিয়েছিলেন আমাকে। কেবলই মনে হয় যে, নির্মলদা সব বুঝেছিলেন, তাই একটুও দেরি না করে যা কিছু বলবার বলে নিলেন। যতই মনে পড়ে যে, নির্মলদা বলেছিলেন, চাঁটগা শহরের বুকে আগুন জ্বালিয়ে দেবেন, যাবার আগে একটা কিছু করে যাবেন ততই মন বলে ওঠে :

"মরমেই মরে গেল, মুকুলেই ঝরে গেল

প্রাণভরা আশা সমাধি পাশে।"

(প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের আত্মজীবনীমূলক লেখাটি থেকে বিপ্লবীদের স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা, সাহসিকতা, দেশের প্রতি তাঁদের নিবেদিত প্রাণের একটি স্বচ্ছ ছবি ভেসে ওঠে।

আত্মহত্যার পরই তাঁর মিলিটারি জামার পকেট থেকে পাওয়া গিয়েছিল সেই প্রবন্ধটি ও শ্রীকৃষ্ণের একটি ছোট ছবি। তাঁর নিজ হাতে লেখা সেইটিকে অনেকে তাঁর 'বিদায়বাণী' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। ধলঘাট যুদ্ধের পর প্রীতিলতার সেই রচনাটি সূর্য সেনের গ্রেপ্তারের সময় সামরিক বাহিনীর হস্তগত হয়। সেই রচনাটিতে 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'র অন্যতম নেতা নির্মল সেনের কথাই ছিল বেশি। বিপ্লবী কাজকর্মে নারীরাও যে পুরুষের থেকে পিছিয়ে নেই তা ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হয়েছিল রচনাটির মাধ্যমে। সুযোগ পেলে মাতৃ শৃঙ্খল মুক্ত করতে যুদ্ধক্ষেত্রে তারাও সমানভাবে লড়াই করতে পারে– রচনাটি পড়লে তা mg¨Kfv‡e বোঝা যায়। রচনাটি স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূণ নথি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। রচনাটি তুলে ধরা হয়েছে পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্য।)

ডায়েরি ও চিঠি

১৩-১৪ জুন, ১৯৩২ প্রীতির বাড়িতে তল্লাশি করে যে ডায়েরিটা পাওয়া যায় সেটি এবং মৃত প্রীতিলতার পোশাক তল্লাসি করে যে চিঠিটা ও এক টুকরো কাগজ পাওয়া যায় তা পড়ে ইংরেজ সার্জেন্ট উইলিসের মনোভাব কী হয়েছিল এখানে দেখা যেতে পারে–

ডায়েরি– "আমি জানিয়ে যাচ্ছি যে, আমি ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার একজন সৈনিক। এ বাহিনী অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের কবল থেকে দেশ জননীকে মুক্ত করতে চায়।... আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি..."

ইংরেজ সার্জেন্ট উইলিস ডায়েরিটা পড়ছেন আর ভাবছেন এ কী লেখা। পরাধীন দেশের একটি মেয়ে কোথা থেকে পেল এমন সাহস। অগ্নিকন্যাই বটে, দেহে প্রাণ নেই। কিন্তু মুখে লেগে আছে দৃপ্ত হাসি। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, পরনে মিলিটারি পোশাক, মেয়ে বলে বোঝাই যায় না। তাঁর পকেট থেকে পাওয়া গেছে এই চিঠি।

উইলিস পড়তে লাগলেন –

"ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতার শত্রু। কোটি কোটি নরনারীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আমাদের সব রকম দুঃখ দৈন্যের মূলে ইংরেজ শাসন। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে, মানুষের জীবন নেওয়া কোনো আনন্দের ব্যাপার নয়। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার পথে বাধা দিলে তাকে যেমন করে হোক সরিয়ে দিতে হবে।"

দীর্ঘ চিঠি প্রীতি লিখেছেন–

"............ আজ দেশের মেয়েরা প্রতিজ্ঞা করেছে তারা পিছিয়ে থাকবে না। স্বাধীনতার যুদ্ধে তারা ভাইদের পাশে এসে দাঁড়াবে। যত কঠিন হোক। যত বিপজ্জনক হোক, সব কাজ তারা করবে... ।"

উইলিস চিঠি বন্ধ করল। এই বিপ্লবীর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে এল তার।...

আর ছোট্ট কাগজের টুকরোতে লেখা ছিল–

কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া–
বাহির হনু তিমির রাতে, তরণীখানি বাহিয়া ।

এইসব বীরাঙ্গনাদের স্মরণে কবি নজরুলের একটি বিখ্যাত রচনার উল্লেখ করে এই প্রতিবেদন শেষ করি–

জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা

জাগো স্বাহা সীমান্তে রক্তটীকা

ধূ ধূ জ্বলে ওঠা ধূমায়িত অগ্নি

জাগো মাতা জাগো কন্যা বধূ জায়া ভগ্নী

পতিতোদ্ধারিণী স্বর্গ-স্খলিতা

জাহ্নবী সমবেগে জাগো পদদলিতা

মেঘে আনো বালা বজ্রের জ্বালা

চির বিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা ।

প্রীতিদির ডায়েরি থেকে

K›`cfv †mb¸ßv

১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর। মাস্টারদা চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে চট্টলার এক গুপ্ত গৃহে অবস্থান করছেন।

পাহাড়তলী শ্বেতাঙ্গ ক্লাবের উপর নৈশ আক্রমণ করা হবে। এই দিনের কর্মকা-ের নেতৃত্ব করবেন প্রীতিলতা। প্রীতিলতা উপস্থিত আছেন কাট্টলীতে। অন্যতম সঙ্গী প্রফুল্ল দাস এই গ্রামেরই তরুণ যুবক। সাহসী ও স্বাস্থ্যবান অভিযাত্রী দলের অন্যতম। প্রফুল্লের সীমাহীন কর্মোৎসাহ। প্রীতিদি মাস্টারদাকে বললেন– মাস্টারদা, জীবনের এই শুভক্ষণটির জন্যেই প্রহর গুণেছি। আপনি আমার জীবনের যে শুভ প্রভাতের সূচনা করলেন তার জন্য আপনার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা মুছে যাবার নয়। কিন্তু আমি যে অনুবর্তী কর্মী হয়ে কাজ করতে চাই। নায়িকার ভূমিকায় আমাকে ঠেলে দিচ্ছেন কেন?

মাস্টারদা দৃঢ় অথচ আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলেন, “বাংলার ঘরে ঘরে আজ বীর যুবকের অভাব নেই, বালেশ্বর থেকে কালারপোল পর্যন্ত এঁদেরই দৃপ্ত অভিযানে দেশের মাটি বার বার তাজা রক্তে সিক্ত হয়েছে। তাই বাংলার ঘরে ঘরে মায়ের জাতিও শক্তির খেলায় মেতেছে; তা ইতিহাসের পাতায় সেই অধ্যায় আজও লেখা হয়নি। তোমার সাফল্যে, তোমার আত্মদানে সে অধ্যায় রচিত হোক এটাই চাই। ইংরেজ জানুক, বিশ্বজগৎ অবলোকন করুক, এ দেশের মেয়েরাও আজ আর পশ্চাতে নেই।” প্রীতিলতা নীরব। মাস্টারদা প্রকোষ্ঠের গবাক্ষ পথে দূরের ওই পায়ে চলা পথের দিকে বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন। প্রীতিদি প্রশ্ন করলেন, ‘কারো কি আসার কথা আছে, মাস্টারদা? মাস্টারদা বাইরে দৃষ্টি রেখে বললেন, “হ্যাঁ তোমার সঙ্গে একাজে যারা যাবে তাদের প্রতীক্ষা করছি।”

কোয়েপাড়ার খেলার ঘাট। কর্ণফুলীর বুকে এই খেলার ঘাট। এই পথে চট্টলার বিপ্লবীরা নিশিরাত যাতায়াত করেন, তারিণী মাঝি এই পথেই এক সাম্পানের মাঝি। দিন নেই, রাত নেই, জোয়ার ভাটার বিচার নেই। ঝড়, তুফান, এমন কি মিলিটারীকেও ভ্রুক্ষেপ নেই। বিপ্লবীদের কর্মে একান্ত সহানুভূতিশীল ও বলিষ্ঠ বুদ্ধিমান মাঝি। দু'চার বার যাতায়াতে সে বিপ্লবীদের অন্তর ও প্রয়োজন, মনে প্রাণে বুঝে নিয়েছিল। বিপ্লবীরাও তার প্রাণের পরিচয় পেয়েছিল সেও স্বদেশ সেবার একজন কর্মী। মাস্টারদা কোথাও যাওয়ার সময় তারিণী কোন দর দস্তুর করতো না। মাস্টারদাও তার চাহিদা কত জিজ্ঞেস না করে পকেট থেকে হাতে যা উঠতো তা দিয়ে দিতেন। তাতে ৫, ১০, ১৫ টাকার বেশি ছাড়া কম থাকত না। এই দিন তারিণী মাঝি খেয়া ঘাটে সাম্পান নিয়ে অপেক্ষা করে আছে। বিপ্লবীদের কয়েকজনকে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিতে হবে। কর্ণফুলীতে জোয়ারের উচ্ছ্বাস। এই জোয়ার ঠেলেই তার পাড়ি দিতে হবে। তারিণী মাঝি উৎকণ্ঠার সঙ্গে বার বার তীরের দিকে দেখছিল। আর ভাবছিল বলা ত যায় না, বিপ্লবীরা আসার পথে হয়ত বা ধরা পড়ে গেলেন, নতুবা দেরী হবার কারণ কী? কিছুক্ষণ পরে লুঙ্গি পরা টুপী মাথায় দু'জন মুসলমান তীরে এসে দাঁড়ায়। গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জী ও ময়লা চাদর। তীরে দ-ায়মান লোকদের স্বাভাবিক কৌতূহল দেখা গেল। তারিণী মাঝি চিনতে কষ্ট হলো না ছদ্মবেশী মনিন্দা ও সুশীলদাকে। তারিণী মাঝি সাধারণের কৌতূহলের মোড় ফিরাবার জন্য গ্রাম্য চাষীর ভাষায় বললো, "ওরে ভাই ওপারের চরের ধান ক্ষেতে যাবে, এত দেরী করলে কেন? ফিরতে কত দেরী করবে? মনিদা ও সুশীলদা গেঁয়ে ভাষায় যথাযথ উত্তর দিয়ে সাম্পানে চড়ে বসলেন। কর্ণফুলীর জোয়ারের টান ঠেলে প্রাণের বেগে সাম্পান উজানে পাড়ি দিল।

সন্ধ্যা অতীত প্রায়। আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা কয়টি সঙ্গে নিয়ে ময়লা চাদরে গা ঢেকে বিপ্লবী মহেন্দ্র চৌধুরী, সুশীল দে, কালী দে ও শান্তি চক্রবর্তী তারিণী মাঝির সাম্পান থেকে নেমে কাট্টলী মাস্টারদার কাছে এসে পৌঁছলেন। মাস্টারদা এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি সকলকে বললেন, 'তোমরা কোচম্যানের পোষাকেই পাহাড়তলী ক্লাবে যাও, কেননা ক্লাবের কাছে সব সময় ঘোড়ার গাড়ির কোচম্যানেরা থাকে। প্রীতিকে মিলিটারি পোশাকেই নিয়ে যাও।' মাস্টারদার কথামতো সকলেই নিজ নিজ পোষাক নিয়ে নিলেন– প্রীতিদিকে সেদিন মিলিটারি পোশাকে অপরূপ মানিয়েছিল। সবাই মাস্টারদার

পায়ের ধূলি মাথায় তুলে নিল। প্রীতিদি ভূলুণ্ঠিত হয়ে মাস্টারদার পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন, মাস্টারদা, জন্মের মতো যাই, আশীর্বাদ করুন, আমি যেন আপনার আদেশ পালন করতে পারি। মাস্টারদা প্রীতিদির মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'বিজয় গর্বে, দৃপ্তা ভগ্নীর গৌরব নিয়ে ফিরে এসো, বোন।' প্রীতিদি স্থির কণ্ঠে বললেন, 'আপনার আশীর্বাদ বিফল হবে না, কিন্তু আমি যাচ্ছি জন্মের মতো।

রাত্রি প্রায় দশটা। নৃত্যগীত মুখর পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব। সেখানে বেশ পূর্ণোদ্যমে Whist drive খেলা চলছিল। প্রায় ৪০ জন শ্বেতাঙ্গ স্ত্রী পুরুষ মদ্যপান করে আনন্দে উন্মত্ত প্রায়। মেইন গেটে একজন সার্জেন্ট, একজন হাবিলদার, চারজন মিলিটারী পাহারায়রত। তাদেরই সামনে দিয়ে গারোয়ানের পোশাকে মহেন্দ্র চৌধুরী ও সুশীল দে ক্লাব ঘরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ক্লাবের লোকেরা মনে করলো 'গাড়োয়ানেরা নাচ দেখতে আসছে।' তাঁদের সাথে রিভলবার ছিল। পূর্বের ব্যবস্থা মতো ক্লাবের পেছনে ছোট রাস্তা ধরে প্রীতিদি ও অন্যান্য সঙ্গীগণ ঢুকে পড়লেন। মনিদা ও সুশীলদা নৃত্যগীতরত সাহেবদের উপর বোমা নিক্ষেপ করলেন। ভীষণ শব্দে বোমা বিদীর্ণ হয়ে 'হলঘর' ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। পেছনের দ্বার থেকে প্রীতিদি ও তাঁর সঙ্গী গণ রিভলবার চালাতে লাগলেন। মুহুর্মুহু গুড়ুমগুড়ুম শব্দ দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হয়ে চললো। ক্লাবঘরের ভেতর শ্বেতাঙ্গ নরনারী ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে হাহাকার করতে লাগলো। ফটকের মিলিটারি পাহারা দল বুঝলো সূর্য সেনের দল ক্লাব আক্রমণ করেছে। তারা প্রাণপণে ছুটে চললো হেডকোয়ার্টারের দিকে। সময়মতো সংবাদ দেওয়া কর্তব্যের অজুহাতে নিজেদের আত্মরক্ষা করার ব্যবস্থা করে নিল। এদিকে প্রীতিদির নির্দেশে ক্লাবঘরের দুইদিকেই আধঘণ্টা যাবৎ আক্রমণ চললো। নাচ ঘরের মধ্যে হতাহত হলো প্রচুর। যারা শক্তিমান ছিল তারা প্রাণ ভয়ে পালিয়ে গেল। সেইদিন বাংলার শ্বেতাঙ্গ সমাজের শক্তির দম্ভকে এই বীরকন্যা প্রীতিদি ধুলায় লুটায়ে দিলেন। ক্লাবঘর আহতদের আর্তনাদে মুখরিত হয়ে উঠলো। কার্যোদ্ধার হয়েছে, বিলম্বে আর লাভ নেই, এইবার সকলে স্থান ত্যাগ করুন, প্রীতিদি এই কথা বলেই স্থিরভাবে দাঁড়ায়ে রইলেন।

এদিকে সন্ধানী আলো ফেলে মিলিটারি গাড়ি বিদ্যুৎবেগে ছুটে আসছে। মহেন্দ্রদা কিছুদূর গিয়ে আবার ছুটে এসে বললেন– প্রীতিদি, শীঘ্র চলুন, প্রীতিদি স্থিরকণ্ঠে ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, আমি ওখানে যাচ্ছি, ভাই

তোমরা এগিয়ে যাও, আমি পটাশিয়াম সায়নাইড খেয়েছি। বিশ্বের ঘুম আমার চোখ দুটিকে আচ্ছন্ন করছে, আমার এই আগ্নেয়াস্ত্রটি নিয়ে যাও, মাস্টারদাকে প্রণাম দিও। গভীর বেদনাভরে মহেন্দ্রদা সেদিন অভিযানের নায়িকা প্রীতির হাত হতে রিভলবারটি নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ক্লাব ঘরে মৃত ও অর্ধমৃত দেহখানির যথাস্থানে প্রেরণ করে মিলিটারি পোশাকে সজ্জিতা প্রাণহীন দেহখানির তল্লাশী আরম্ভ হলো। পাওয়া গেল শ্রীকৃষ্ণের ছবি, শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফটো, পাহাড়তলী ক্লাবের প্ল্যান, একটি চামড়ার বেল্ট, তিনটি রিবন (ফিতা), Republican Army নোটিশ, তিনটি রিভলবারের কার্তুজ, একটি শিশ বাঁশী, প্রীতিদির স্বহস্ত লিখিত একটি বর্ণনা।

এই বর্ণনায় তিনি লিখে গেছেন, চট্টগ্রাম বিপ্লবীরা স্মরণীয়। ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ইং এবং তৎপরে জালালাবাদে, ফেনীতে, কালারপোলে, চন্দননগরে, চাঁদপুরে, ঢাকায়, কুমিল্লায় ও ধলঘাটে যে অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেছে তাতে কেবল বাংলায় নয়, সমগ্র দেশের যুবক যুবতীদের মন আকৃষ্ট করেছে। আমরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছি, আজকের এই অভিযান তারই একটি অংশ। "আমাদের মাস্টারদা যখন আমাকে আহবান করেন, তখন আমি পূর্ণ দায়িত্ব বুকে বাংলার তরুণ তরুণীর ললাটে রক্ত তিলক পরিয়ে বীর শহীদের পাশে মহিমার কৃতিত্বে চিরভাস্বর হয়ে রইলাম। এই প্রীতিদির আদর্শে অনুপ্রাণিত ও অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে প্রীতিদির স্মৃতিতে দুর্বার হয়ে উঠলো কল্পনা দত্ত, লেখিকা নির্মলা, বাণী দাশগুপ্তা, সুহাসিনী, নিরুপমা ও বকুল দত্ত। এদেরকে মাস্টারদা সেদিন উপেক্ষা না করে আগ্রহভরে বরণ করে নিয়েছিলেন। পাহাড়তলী আক্রমণের পর এদেরকে নিয়ে দ্বিতীয় অভিযান চালাবার সময় মিলিটারি বেশে অর্ধপথে বিপ্লবী নায়িকা কল্পনা দত্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়ায় দ্বিতীয় অভিযান প- হয়ে যায়।

বারবার বিপ্লবী নেতৃত্বের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতায় বাস্তবমুখী কর্মপন্থা নিয়ে, মাস্টারদা (সূর্য সেন) অম্বিকাদা, নির্মলদা, গণেশদা, অনন্তদা, লোকনাথদা প্রমুখ বিপ্লবীরা ১৯২৮ সালে ব্রিটিশ সরকারের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে, পূর্বেকার বিপ্লবী প্রচেষ্টাগুলি একে এক বিশ্লেষণ করলেন দিনের পর দিন, ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পরিণতি হলো আপোষ। সে আন্দোলনে অংশগ্রহণের ফলে নিজেদের বিপ্লবী শক্তি বৃদ্ধির পথে সক্রিয় না করে হয়ে গেল নিষ্ক্রিয় নির্জীব। অনতিবিলম্বে কর্ম মুখর ও সজীব করে তোলার জন্য অন্ধকারময় কক্ষে বসে বিস্ফোরণ তৈরি ও তারই অবধারিত ফল

পাহাড়তলীতে পুলিশের সাথে গুলি বিনিময়। গুলির আঘাতে মাস্টারদা ও অম্বিকাদা আহত হয়ে পুলিশের হাতে বন্দী হলেন।

পলাতক অবস্থায় অনন্তদা, হাওড়ার পুলের উপর থেকে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করতে গিয়ে গঙ্গাবক্ষেই বন্দী হন, সরকারি পুলিশের নেতা প্রফুল্ল চক্রবর্তীর হাতে। অগৌণে প্রেমানন্দ নামে বিপ্লবীর গুলিতে প্রফুল্ল চক্রবর্তী অকালে স্বর্গপ্রাপ্ত হন। অনন্তদাকে ধরিয়ে দেওয়ার প্রতিশোধ প্রেমানন্দ এভাবেই নিয়েছিলেন। মাস্টারদা, অম্বিকাদা ও অনন্তদা সেই মামলায় নির্দোষ হয়ে, আবার বিপ্লবী প্রচেষ্টা মাস্টারদা শুরু করলেন। দেওঘরে বিস্তার হলো ষড়যন্ত্র, দক্ষিণেশ্বর ষড়যন্ত্র প্রকাশের কিছুকাল পরে কলকাতায় ১৯২৬ সালে মাস্টারদা আবার ধৃত হলেন। ইংরেজ কারাগারে অন্যান্য সহকর্মীর মতো দিন কাটালেন। অনেক সহকর্মীকে চিরতরে হারালেন সুস্পষ্ট আদর্শ ও সুদৃঢ় কর্মপন্থার উপর ভিত্তি করে, চট্টগ্রামে পার্টি করলেন Indian Republican Army Chittagong Branch এ ছিলেন ইংরেজ বা বিদেশি শাসক।

শাসন ও শোষণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়ার নামকরণ করলেন Complete ওহফবঢ়বহফবহপবকায়েম করা। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ার জন্য সুসংগঠিত সুশৃঙ্খল বিপ্লবী বাহিনী গঠন বিষয়ে সকলেই একমত হলেন। অতীতের ভ্রান্তি সমাধি হলো এখানে।

কাল বিলম্ব না করে বিভিন্ন দপ্তর বণ্টন হলো, চললো বিপ্লবের প্রস্তুতি। শহরের আনাচে কানাচে গড়ে উঠলো ক্লাব লাইব্রেরি, স্কুল কলেজে ছাত্র আন্দোলন। সুসংগঠিতভাবে গ্রামে গ্রামেও ক্লাব লাইব্রেরি গঠন হলো এবং ছাত্র আন্দোলন শুরু হলো স্কুলে স্কুলে। এই শক্তি নিয়ে মাস্টারদা লাহোর কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব পেলেন। যে বিপ্লবী শক্তি কলকাতা কংগ্রেসে Complete Independence প্রস্তাব পরাজিত হলো। আপোষহীনকারীদের কাছে সে শক্তি লাহোর কংগ্রেসে পরাজিত করলো নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধী শক্তিকে।

লাহোর প্রস্তাবে সারা দেশবাসীকে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় ডাক দিল। সারা দেশ আইন অমান্যের পথে ঝাঁপিয়ে পড়ল। গণ সংযোগ বিহীন বিপ্লবী শক্তি জানত, যদি সুশৃঙ্খল সংঘবদ্ধ বাহিনী নিয়ে, দৃঢ়পদে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কৌশল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকারী জনতার সামনে তুলে ধরা যায়, তবে মোহগ্রস্ত জনতা বিপ্লবের পথে এগিয়ে আসবে। জনতার অগ্রগামী গণ শক্তিকে ভিত্তি করে বিপ্লবী শক্তি গড়ে না ওঠা পর্যন্ত এই পথেই ইতিহাসের ইঙ্গিত।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল। ইংরেজের সুরক্ষিত অস্ত্রাগার থেকে, অস্ত্র কেড়ে নিয়ে, অস্ত্রাগার দখল করে, অত্যাচার ও শোষণের যন্ত্রকে বিকল করে চট্টগ্রামের পর্বত শিখরে স্বাধীনতার প্রথম বিজয় পতাকা উড্ডীন করা হলো। সমস্ত ইংরেজ স্ত্রী পুরুষ শিশু প্রাণ ভয়ে পালিয়ে গেল, স্টীমারে করে বঙ্গোপসাগরের বীচে বিক্ষুব্ধ বক্ষে স্বাধীনতার জন্যে আত্মাহুতির ডাক এসে গেল ঘরে ঘরে।

বিপ্লবীরা বিপ্লবের বীজ বপন করে যায়, অক্লেশে বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে সাময়িক বিপ্লবী সরকারের প্রথম সভাপতি হলেন মাস্টারদা, লাহোর প্রস্তাব সার্থকতার পথে বিপ্লবীরা এগিয়ে নিয়ে গেল। তা সত্ত্বেও লাহোর প্রস্তাবই একমাত্র গ্রহণযোগ্য বিপ্লবী প্রস্তাব। একথা কোনো দিনই বিপ্লবীরা স্বীকার করেননি, ও প্রস্তাবের মূল অংশকেই তারা প্রাধান্য দিতেন। Complete Independence-কে যা এতকাল কংগ্রেসী মহলে স্বীকৃত হয়নি, ঢাকা বিপ্লবীদের কাছে অতি সুস্পষ্ট প্রস্তাবের মুখ রক্ষার জন্য, যে নিষ্ক্রিয় নেতৃত্ব প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যায়, আপোষের পথে তার শেষ রফা তবুও এ আন্দোলন যে জনতাকে নাড়া দিয়ে সংগ্রামকাঙ্ক্ষী করে তুলে শেষ রফা তাকে তবুও স্ত্রৈণ নেতৃত্বের আবেষ্টনী থেকে ছিনিয়ে বিপ্লবমুখী করে সম্ভব চরম ত্যাগী ও দৃঢ় বিপ্লবী নেতৃত্বে।

বিপ্লব মানে-গতানুগতিক নীতির পরিবর্তন। বিপ্লবী নেতৃত্বে এককাল পরে, সঠিক পথে পা বাড়ালো। চমকে উঠলো সারা দেশের জন সমাজ। এ বিপ্লবী আন্দোলন একদিকে যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হৃৎপিণ্ডে ক্রমাগত প্রচ-বেগে আঘাত শুরু করলো, অন্যদিকে নিষ্ক্রিয়। প্রতিরোধী শক্তি ক্রমাগত নিষ্ক্রিয়তার সাথে নেমে গেল বিপ্লবী অভ্যুত্থানের ফলে। জনতা অভিনন্দন জানালো, জন সমর্থন গড়ে উঠলো। যে বিপ্লবী শক্তি জনসমর্থনে তার বুনিয়াদ একবার পাকা নিরেট করে নিয়েছে সম্পূর্ণ স্বাধীন শোষণ মুক্ত ভারতীয় সমাজ গড়ে ওঠার পরও এ শক্তি ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষ ও উন্নতির পথে অগ্রগামী সহায়ক হিসেবে বেঁচে থাকবে।

এই জন্যই ১৮ই ও ২২শে এপ্রিল প্রত্যেক স্বাধীনতাকামীদের কাছে অভিনন্দন পায়। কেননানির্জীব দেশ সেদিন তার প্রাণ স্পর্শ পেয়েছিল সারা দেশে বিপ্লবী মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি সৃজন করবার জন্য যে নেতৃত্ব মুষ্টিমেয় যুবক নিয়ে বিশাল স্রোতের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত পাড়ি জমিয়েছিল, তা সার্থক– তার জয়ধ্বনি হেঁকে বললেসাবাস সাবাস ধন্য।

আবহমান কাল ধরে, যে বিপ্লবী শক্তি সীমাবদ্ধ আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছিল, সম্ভুক ছিল তার গতি। নিমেষে প্রবিষ্ট হলো শাসিত গণমনের নিভৃত প্রকৌষ্ঠে সযত্ন দরদে লালিত হয়ে পলকে বলিষ্ঠ দেহে নবতর শক্তিতে ভূষিত হয়ে উঠল। সীমাহীন ত্যাগে নিষ্ঠুর পীড়নে সে শক্তি হলো নির্ভেজাল। খাঁটি শত্রুর বিপুল আক্রমণে মরণপণ আঘাত হেনে প্রতিকূল শক্তিকে করলো পর্যুদস্ত।

জনতা আকুল অভ্যর্থনা জানিয়ে আপন ঘরে ডেকে নিলে পথের পথিককে। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর শত্রুর শত রাশি নির্যাতন অত্যাচার, আর্থিক দুর্গতি সামাজিক ও দৈহিক ক্ষয়ক্ষতি অকুণ্ঠ সহনশীলতার নৈতিক বল আহরণ করেছে, জনগণ মুষড়ে পড়েনি কোনোদিন।

২২শে এপ্রিল রাত্রে জালালাবাদ পাহাড়ে স্বাধীনতার ঐতিহাসিক সংগ্রাম সহকর্মীদের গুলিবিদ্ধ নির্জীব দেহগুলি বিপ্লবীরা বৈপ্লবিক সম্মানে সম্মানিত করে নেমে গেল জনপদে, যেখানে জনতা আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে কবে কিভাবে ডাক পড়বে তাদের কোন কাজে।

শ্রান্ত অনিদ্র অভুক্ত বিপ্লবীরা, জনতারা সংগ্রামী সৈনিক ও নেতা হিসেবে আশ্রয় পেল ঘরে ঘরে। শাসকগোষ্ঠী রটিয়ে দিল এরা লুণ্ঠনকারী সন্ত্রাসবাদী। ঘোষিত হলো পুরস্কার। নির্লোভ নির্ভীক জনতার কাছে বিপ্লবীরা সক্রিয় সমর্থন পেল। পুরস্কৃত হলো। ঘোষিত হলো বিপ্লবীরা আমাদের সন্তান। আমাদের সংগ্রামকারী নেতা ও সৈনিক। মা বোনেরা খুলে দিলেন বহুমূল্যবান অলংকার। ভাই এবং বৃদ্ধ পিতা উপহার দিলেন, তাঁদের সম্পদ ও শ্রম। অথচ প্রতিক্রিয়াশীল বিদেশি শোষক শক্তি রটাল এরা ফেরারী।

জনশক্তি যে বিপ্লবী শক্তিকে সহৃদয়তার সামান্য বিকাশ লাভে অনুকূল পরিবেষ্টনী গড়ে দেয়, সে আবেষ্টনীতে মাস্টারদার বিভিন্নমুখী বিরাট সৃষ্টি প্রতিভায় প্রীতিলতার সৃষ্টি আকর্ষণীয় নয়। যদিও বিপ্লবী আন্দোলনে প্রীতিদির আত্মদান একটি নতুন আখ্যান।

বিজয়া

mh †mb

আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে কত 'বিজয়াই' তো এসে গেছে। কিন্তু আজকের বিজয়া আর অন্য বিজয়ার মধ্যে কত তফাৎ– এবারকার 'বিজয়া' যেন সবচেয়ে বেশি মূল্যবান।

জীবনে যা দেখিনি, জীবনে যা পাইনি, জীবনে যা শিখিনি, এমন কত অভিনব জিনিস নিয়েই বিজয়া এল আমার কাছে। কত নতুন অভিজ্ঞতাই সে নিয়ে এল। গত দু'মাস যেন আমার জীবনের অভিনব, অভূতপূর্ব অধ্যায়। এই দু'মাসের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, আনন্দ, বিষাদ, জ্বালা আমার জীবনের খুব বড় সঞ্চয়ই হয়ে রইল।

আজ বিজয়ার দিনে মায়ের কাছে প্রার্থনা করছি, যেন এই অমূল্য সঞ্চয়টুকু আমার জীবনকে ঐশ্বর্যময় করে তোলে। এই দু'মাসের সব কিছুর মধ্যে আনন্দই সবচেয়ে ছাপিয়ে উঠেছে। এত আনন্দ জীবনেও পাইনি। বিষাদ আর জ্বালা আনন্দকে আরো মধুময় করে তুলেছে। আমার দুর্ভাগ্য– একান্ত দুর্ভাগ্য, এমন প্রাণ মাতানো আনন্দের মধুর স্মৃতিই আজ আমায় অহরহ ব্যথা দিচ্ছে।

আড়াই বছরের মধ্যে তিনটি 'বিজয়া' এল। এর মধ্যে কত অন্তরঙ্গ বন্ধু, কত আদরের ভাইবোনের জীবনের 'বিজয়াই' চোখে দেখলাম। আর পূর্ণ দায়িত্বই ঘাড়ে নিলাম। আজ একে একে সব কথা মনে পড়ছে।

আজ এমন পবিত্র দিনে তাদের কথা মনে করে আমার মতো কঠিন হৃদয়ের চোখেও জল আসছে। তাদের বীরত্বের কাহিনী মনে করে আমার গৌরবে বুক ফুলে উঠছে। নরেশ, বিধু, টেগরা, ত্রিপুরা, মধু, অর্ধেন্দু, প্রভাস, নির্মল, পুলিন, মতি, শশাঙ্ক, জিতেন, আনন্দ, অমরেন্দ্র, মনা, রজত, দেবু, স্বদেশ, মাখন, রামকৃষ্ণ, ভোলা সবারই কথা আজ একে একে মনে পড়ছে। আর স্মৃতির মধ্যে দিয়ে তাদের 'বিজয়ার' সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

কত জীবনের বিজয়ার নিমিত্তই হলাম। কত স্নেহময়ী জননীর বুক শূন্য করে তাঁর সোনার পুতলিকে স্বাধীনতার বেদীমূলে আহুতি দিয়েছি। কতজনকে

অন্তরীণে, কারাগারে, নির্বাসনে, দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছি, ঘরে ঘরে হাহাকারের সৃষ্টি করেছি। দেশের উপর গভর্নমেন্টের অত্যাচার, নির্যাতন টেনে এনেছি। এসবের দায়িত্ব থেকে নিজেকে বাদ দিই কী করে?

মা আনন্দময়ী মা আমার, আজ তোমার বিসর্জনের দিনে তোমায় একান্ত ব্যাকুল হয়েই জিজ্ঞাসা করছি– আমি কি অন্যায় করে যাচ্ছি? পনেরো বছর আগে অনেক ভেবে চিন্তে, ভালো-মন্দ বিচার করে জীবনের যে লক্ষ্য, যে আদর্শ অটুট আছে, আমি অন্যায় করছি না, পাপ করছি না। দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে আমার দেশে যে হাহাকার অত্যাচারের সৃষ্টি হয়েছে ও এর চেয়ে আরো অনেক বেশি– সব দেশেই তাই হয়েছে। আমার আদর্শের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখেই আমার পথে আমি চলেছি। এখনও কোনো দ্বিধা আসেনি।

আমি যেন বড় নিষ্ঠুর ছিলাম। কিন্তু গত দু'মাসের পথ চলা যেন আমার নিষ্ঠুর হৃদয়ের মধ্যে মমতা এনে দিয়েছে। সেজন্য আমি চিন্তা করছি না। কিন্তু তাদের বুকভাঙা ক্রন্দন, মর্মভেদী হাহাকার যে আমার বুকে ভীষণ বাজছে।

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কত স্নেহময়ী জননী তাঁর আদরের সন্তানকে হারিয়ে মর্মান্তিক কান্নাই কাঁদছেন। কি অসহ্য বেদনায় তাঁর হৃদয় অস্থির হয়ে উঠেছে– 'বিজয়ার' এমন আনন্দের দিনটি তাঁর কাছে কত যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে। বাপ তাঁর আদরের দুলালকে হারিয়ে বিজয়ার দিনে সমস্ত উৎসবকে বিষাদময় করে তুলেছেন। ভাইবোন তাদের স্নেহের ভাইবোনকে হারিয়ে আজ কত অসহনীয় যাতনাই ভোগ করছে। কত বড় অভাববোধ তাদের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করছে। এসব ভেবে আমার মতো পাষাণও আজ গলে যাচ্ছে।

পনেরো দিন আগে যে নিখুঁত পবিত্র, সুন্দর প্রতিমাটিকে এক হাতে আয়ুধ, অন্য হাতে অমৃত দিয়ে বিসর্জন দিয়ে এসেছিলাম, সেই কথাই আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে। তার স্মৃতি আজ সবকে ছাপিয়ে উঠেছে।

যাকে নিজের হাতে বীর সাজে সাজিয়ে সমরাঙ্গনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুমতি দিয়েছিলাম, তার স্মৃতি যে আজ পনেরো দিনের মধ্যে এক মুহূর্তে ভুলতে পারলাম না। সাজিয়ে দিয়ে যখন করুণভাবে বললাম, "তোকে এই শেষ সাজিয়ে দিলাম। তোর দাদা তো তোকে জীবনে আর কোনোদিন সাজাবে না। তখন প্রতিমা একটু হেসেছিল। কি করুণ সেই হাসিটুকু। কত আনন্দের, কত বিষাদের, কত অভিমানের কথাই তার মধ্যে ছিল। সে নীরব হাসিটুকুর মধ্যে অফুরন্ত কথা আমার সারা জীবন ভাবলেও শেষ করতে পারবে না– শেষ করতে চাইও না। তা যেন

আমার জীবনে নিত্য নতুন চিন্তার উপকরণ যুগিয়ে আমার জীবনকে ঐশ্বর্যময় করে তোলে। দিন দিন উন্মত্ত করে তোলে।

সে তো নিজের হাতে অমৃত পান করে অমর হয়ে গেছে। কিন্তু মনজগতে আমরা তার বিসর্জনের ব্যথা যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

আজ 'বিজয়ার' দিনে, সে দিনের 'বিজয়ার' করুণ স্মৃতি যে মর্মে মর্মে কান্নার সুর তুলছে– চোখের জল যে কিছুতেই রোধ করতে পারছি না। "চাপিতে গেলে উঠে দু-কূল ছাপিয়া।" সে যে আমার আনন্দের উৎস– নির্দোষ, নিষ্পাপ ছিল– সুন্দর পবিত্র মহান ছিল। তার মধ্যে একাধারে কত গুণ দেখেছি, আর কোনো মানুষের মধ্যে আমি ততখানি দেখিনি। তার অন্তরের সৌন্দর্য আমায় মুগ্ধ করেছিল। তার মনের জোর, দৃঢ় সংকল্প, সাহস, বীরত্ব কারো চেয়ে কম দেখিনি। তার সরলতা, বাধ্যতা খুব সুন্দরই ছিল। তার শিক্ষা, আদর্শের অনুভূতি, সুন্দর ব্যবহার কিছুরই অভাব ছিল না।

সর্বোপরি কঠোর বিপ্লবী মনোভাবের মধ্যে ভগবানের উপর অটুট ভক্তি, বিশ্বাস, সে যেভাবে বজায় রেখেছিল, তা দেখলে বাস্তবিকই শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হয়।

এত গুণের আধার ছিল বলে তাকে খুবই স্নেহ করতাম– হৃদয়ের সমস্ত উজাড় করে তাকে দিয়েছিলাম– প্রতিদানে অসীম আনন্দই পেয়েছি, এত আনন্দ জীবনে পাইনি।

এত স্নেহ, এত আদরের প্রতিমাকে নিজ হাতে বিসর্জন দিয়ে চলে এলাম। তাই সেদিনের কথা আজ কেবলই মনে পড়ছে। মনে পড়ছে সেই প্রতিমাকে।

যে এত অফুরন্ত আনন্দ আমায় দিল, এত গুণ দেখিয়ে গেল, এত মহৎ আত্মদান করে গেল, দেবতার মতো শ্রদ্ধা আমায় দিল, সে সব কথা মনে আজ আনন্দ না পেয়ে তাকে সরাবার ব্যথাই আমার প্রাণে এত বেশি বাজছে– আজ আমার এই একমাত্র দুঃখ।

অসুর-দলনী মা আমার। আজ বিজয়ের দিনে তোমার কাছে এই কামনা করি, তুমি আমায় এই বর দাও– যেন তার স্মৃতি আমাকে আনন্দ দেয়, তার গুণের কথা মনে হলে যেন আমি গৌরব অনুভব করি।

তার অপূর্ব আত্মদান আমার প্রাণে যেন আনন্দ দেয়, আমাকে যেন আরো শক্তিমান করে তোলে, তার শ্রদ্ধা যেন আমাকে তার শ্রদ্ধার উপযুক্ত করে তোলে– তাকে হারাবার ব্যথাটা এত আনন্দকে ছাপিয়ে যেন কিছুতেই না ওঠে।

আমার স্নেহের প্রতিমাকে বলছি– রাণী, তোকে আমি কতদিন কতই না ব্যথা দিয়েছি। আজ 'বিজয়ার' দিনে তোর দাদার সব দোষ ত্রুটি ভুলে যা, আমার উপর আর অভিমান রাখিস না।

তোকে হৃদয় উজাড় করে স্নেহ করেছি, তোর গুণ দেখে দেখে মুগ্ধ হয়েছি– তোর ভগবৎ ভক্তি দেখে তোকে শ্রদ্ধা করেছি। তোর সঙ্গে প্রাণ খুলে নিঃসঙ্কোচে মিশেছি।

এত আপনার করে নিয়েছিলাম বলেই হয়তো তোকে সামান্য দোষে অথবা বিনা দোষে কত গাল দিয়েছি। হয়তো কোনো সময় ভুল বুঝে তোর মনে ব্যথা দিয়েছি। তোকে খুব স্নেহ করতাম, তোকে হাজার গাল দিলেও তুই আমার উপর রাগ করবি না। কোনোদিন রাগ করিসনি, শেষ মুহূর্তে ভুল করে আমি একটু গাল দিয়েছিলাম বলে তুই হয়তো অভিমান নিয়ে গেছিস। আজকের দিনে তুই যেখানে আছিস সেখানে থেকেই আমায় ক্ষমা করে যা।

শেষ মুহূর্তে একটু কষ্ট দিয়েছি বলে আমি যে দিনরাত অশান্তির দহনে দগ্ধ হচ্ছি, তা তো তুই দেখছিস। তোর দাদা যাতে শান্তি পায়, তার ব্যবস্থা তুই করে দে।

তোর কি মনে নেই, তুই তোর দাদার দুঃখ একটুও সহ্য করতে পারতিস না। তাই আবার বলছি, আজকের এই পবিত্র দিনে আমার দোষ ত্রুটি সব ভুলে গিয়ে হাসিমুখে তোর দাদার 'বিজয়া' সম্ভাষণ গ্রহণ কর। আমার স্নেহের সম্ভাষণ– শ্রদ্ধার সম্ভাষণ তোকে জানাচ্ছি।

আজ মিলনের দিন, ভেদাভেদ ভুলে যাওয়ার দিন। আজ তুই আমার পাশে থাকলে যে আনন্দ আমি পেতাম, দূর থেকেও সে আনন্দ তুই আজ আমাকে দে।

এমন সুন্দর দিন মায়ের নামটি নিয়ে প্রাণ খুলে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে, তোর মতো নিষ্পাপ, নির্দোষ, নিষ্পলক আমি কাউকে পাইনি। বাস্তবিক ফুলের মতো তুই সুন্দর, পবিত্র ও মহান ছিলি। তোর অপূর্ব আত্মদান তোকে আরো সুন্দর, আরো মহনীয় করে তুলেছে। বরযাত্রী মা আমার– আমায় আশীর্বাদ কর, তা যেন আমার ও আমার প্রিয় ভাইবোনের জীবনে প্রতিফলিত করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি না করে।

(প্রীতিলতার আত্মাহুতির ১৫ দিন পরে মাস্টারদা সূর্য সেন তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে 'বিজয়া' লিখেছিলেন। চিঠিটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য চট্টগ্রাম পরিষদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রকাশনায় শচীন্দ্রনাথ গুহ সম্পাদিত 'চট্টগ্রাম বিপ্লবের বহ্নিশিক্ষা' বই থেকে সংগৃহীত।)

পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ

ex‡iki ivq
২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২

চট্টগ্রামে ইউরোপীয়দের ক্লাব আক্রমণ করে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকা-ের প্রতিশোধ নেবার কর্মসূচি, চট্টগ্রাম বিদ্রোহের দিন ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল, সফল হয়নি। মাস্টারদা সূর্য সেন একথা ভোলেননি, তাই গুপ্ত শিবির থেকে তিনি ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের জন্য আবার তৎপর হন।

চট্টগ্রামে ইউরোপীয়দের তখন দুটি ক্লাব। একটি পল্টন ময়দানে। এ-অঞ্চলে কড়া সামরিক ও পুলিশ পাহারা চব্বিশ ঘণ্টা মোতায়েন থাকত। অপর ক্লাবটি হলো পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব। শহরের উত্তর দিকে পাহাড়তলী স্টেশনের কাছে এই ক্লাব। এখানেও প্রায় সমান পুলিশী সতর্কতা। ক্লাবটিতে প্রধানত রেলের সাহেবরা আসত, অন্যান্য সাহেবরাও নিরাপদ ভেবে এই ক্লাবেই অবসর বিনোদনের জন্য নাচ-গান-পান-ভোজন করত। শাসকশ্রেণীর বাঘা বাঘা শ্বেতাঙ্গরাও তখন আভিজাত্যের কথা ভুলে পাহাড়তলী ক্লাবে মাঝে মাঝে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে এক গেলাসের ইয়ার বনে যেত। এ-সময়ে তাই পাহাড়তলী ক্লাবের মান পল্টন ক্লাবের থেকে কম ছিল না।

পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণ বিষয়ে শ্রী দীনেশ দাশগুপ্তের কাছ থেকে, এরপরে অন্য সূত্রেও খবর জোগাড় হয়। ক্লাবের অবস্থান, সভ্যতার গতিবিধি, পাহারা বদলি, রাস্তাঘাট, আক্রমণের আগে ও পরের আশ্রয়স্থল– এসব বিষয়ে নানা সূত্রে খবর নিতে হয় ও ব্যবস্থা করতে হয়।

হঠাৎ খবর এল ১৯৩২-এর ১০ আগস্ট একটা বড় অনুষ্ঠান ক্লাবে হবে। খবর পেয়ে মাস্টারদা ওই দিন শৈলেশ্বর চক্রবর্তীকে নেতা করে বিপ্লবী দলকে ক্লাব আক্রমণের নির্দেশ দেন। পড়ৈকোড়া গ্রামের রমণী চক্রবর্তীর বাড়ি তখন দলের গুপ্ত শিবির, নাম 'কুন্তলা'। 'কুন্তলা' শিবিরে মাস্টারদা ও প্রীতিলতাকে

রেখে তারকেশ্বর দস্তিদার (ফুটুদা), কালীকিঙ্কর দে ও শৈলেশ্বর চক্রবর্তী পাহাড়তলী ক্লাবের নিকটে কাট্টলি গ্রামে চলে আসে। কাট্টলি শিবির থেকে আক্রমণে অংশগ্রহণ করার জন্য যারা রওনা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল শৈলেশ্বর চক্রবর্তী (নেতা), কালীকিঙ্কর দে, মহেন্দ্র চৌধুরী, সুশীল দে, শান্তি চক্রবর্তী ও বীরেশ্বর রায় (লেখক)। ফুটুদা বোমা, রিভলবার, রাইফেল ও তরবারিতে সজ্জিত বিপ্লবী যাত্রা করিয়ে দিলেন।

পাহাড়তলী ক্লাবের অতি কাছে পাহাড়ের উঁচু ঢালে জঙ্গলের আড়ালে বিপ্লবীরা অপেক্ষা করছে। নিচ থেকে সবুজ সংকেত পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই একসঙ্গে আক্রমণ শুরু করবে। কিন্তু সে-রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও কোনো সংকেত পাওয়া গেল না। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সবাইকে ফিরে যেতে হলো। এই ব্যর্থতার আঘাত সহ্য করতে না পেরে শৈলেশ্বর চক্রবর্তী ক্ষোভে আত্মহত্যা করেন।

কয়েকদিনের মধ্যে খবর এল পাহাড়তলী ক্লাবে আবার জমজমাট জলসা বসবে ২৪ সেপ্টেম্বর। যুদ্ধজাহাজের বড় বড় সব সাহেব সুবো জড়ো হবে। জেলাশাসক এ এস হ্যান্ডস ও বিভাগীয় কমিশনার উপস্থিত থাকবে। খবর পেয়ে এবার মাস্টারদা স্বয়ং আক্রমণের জায়গার কাছাকাছি কাট্টলি গ্রামে ফুটুদা ও প্রীতিলতাকে নিয়ে হাজির। গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা হলো, ঠিক হলো আক্রমণকারীদের পরনে লুঙ্গি ও শার্ট থাকবে, গায়ে চাদর থাকবে ও মাথায় পাতলা কাপড়ের টুপি থাকবে। এ হলো চাটগাঁয়ের সাধারণ মুসলমানের পোশাক। এবারের আক্রমণের নেত্রী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। প্রীতিলতার পরনে ছিল মালকোঁচা করে পরা ধুতি, মাথায় পাঞ্জাবিদের মতো পাগড়ি, বুকে একটি সুদৃশ্য লাল রঙের নিশান বা ব্যাজ। সকলের পকেটে এক-একটি নিজস্ব জবানবন্দি ও ইশতেহার ছিল। প্রসঙ্গত বলা যায় প্রীতিলতার জবানবন্দিটি তাঁর মৃতদেহ থেকে পুলিশ উদ্ধার করে।

২৪ সেপ্টেম্বর আবার ক্লাব আক্রমণের জন্য যাত্রার দিন। এবারে নেত্রী প্রীতিলতা। সেদিন সকালে আক্রমণে যারা তারা সবাই মিলে মাস্টারদা ও ফুটুদাকে ঘিরে বসল, মাস্টারদা তখন ধীরভাবে জানালেন যে সেদিনের অভিযানের নেত্রী হবেন প্রীতিলতা। প্রীতিদি ভাইদের যোগ্যতার কথা ভেবে আপত্তি তুললে বাকি সবাই এক বাক্যে প্রীতিলতাকেই আক্রমণকারী দলের নেত্রী হিসেবে মেনে নিলেন।

এবার আক্রমণের ছক মাস্টারদা বুঝিয়ে দিলেন, বিলিয়ার্ড হলের দিকে থাকবে ঠিক হলো বীরেশ্বর রায়, প্রফুল্ল দাস ও পান্না সেন। ক্লাববাড়ির হলঘর

আক্রমণে থাকবে প্রীতিলতা স্বয়ং আর সঙ্গে থাকবে কালীকিঙ্কর দে ও শান্তি চক্রবর্তী। আর সামনের দিকে যে দরজা ও জানালা সেগুলি আগলে থাকবে সুশীল দে ও দীনেশ চক্রবর্তী। আর সামনের দিকে যে দরজা ও জানালা সেগুলি আগলে থাকবে সুশীল দে ও দীনেশ চক্রবর্তী। আক্রমণকারীর সংখ্যা এবার বেড়ে হয়েছে আটজন। অস্ত্রশস্ত্রও অনুরূপ। সুশীল ও মহেন্দ্রের সাথে ছিল রাইফেল ও হাতবোমা। প্রীতিলতা ও কালীর সঙ্গে ছিল রিভলবার ও হাতবোমা। শান্তির সঙ্গে ছিল তরবারি ও বোমা। পান্না সেন, প্রফুল্ল ও বীরেশ্বরের কাছেও রাইফেল, হাতবোমা ও পিস্তল ছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার একটু গাঢ় হলেই বিপ্লবী দল সামরিক কায়দায় মাস্টারদা ও ফুটুদাকে অভিবাদন জানিয়ে মৃত্যুপণ আক্রমণের উদ্দেশ্য বেরিয়ে পড়ল। আর মাস্টারদা ও ফুটুদাও জলপথে তারিণী মাঝির সাম্পানে বটতলীর আশ্রয়ের দিকে যাত্রা করলেন।

আবার সেই পাহাড়ের গোড়ার সংকেতের জন্য প্রতীক্ষা চলল। ২৪ সেপ্টেম্বরের রাত তখন সাড়ে ন'টা হবে, ক্লাবঘর থেকে বিপ্লবী বন্ধু আক্রমণের নিশানা দেখাল। নেত্রী প্রীতিলতা নির্দেশ দিল আক্রমণের। বিপ্লবী ভাইরা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্লাবগৃহের উপর। ঘন ঘন গুলি ও বোমার আওয়াজে চত্বরটি কেঁপে উঠল। স্বভাবতই ক্লাবঘরের সব বাতি নিভে গেল তার কেটে গিয়ে। নেমে এল অন্ধকার। তার মধ্যে সাহেবদের ভয়ার্ত চিৎকার, ইতস্তত ছুটাছুটি। বিপ্লবীরা এবার টাইমবোমাতে লোশান দিয়ে সেগুলি ঘরে ঘরে রেখে দিল। আর পলায়নরত সাহেবদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ার বিরাম ছিল না। সাহেবদের নাচের আসরকে, গানের জলসাকে শ্মশানে পরিণত করে দিয়ে বিপ্লবীরা ফিরে এসেছিল। ফেরেনি শুধু একজন। সেদিনকার দুঃসাহসী অভিযানের নেত্রী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। প্রীতিলতার দেহ ক্লাবগেটের বাইরে পড়ে রইল, তিনি স্বেচ্ছায় আত্মবিলোপ করেছিলেন। বাকি বিপ্লবী ভাইয়েরা অগ্নিযুগের প্রথম নারী শহীদ প্রীতিলতাকে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানিয়ে সে-স্থান ত্যাগ করে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে প্রীতিলতা অন্যান্য বন্ধুদের দ্রুত চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে যান। এদিকে পূর্বের ব্যবস্থামতো দীনেশ চক্রবর্তী ক্লাবঘরের নিকটে অপেক্ষা করছিল। প্রথম বোম বিস্ফোরণের শব্দ শুনেই সে সাইকেলে পাথরঘাটায় যায়। সেখানে শান্তি সেন, সরোজ চৌধুরী, সুশীল দাস, নরেশ দাস অপেক্ষায় ছিল; দীনেশ চক্রবর্তীদের মুখে খবর শোনার পর এরা মাস্টারদার নির্দেশমতো শহরের পাড়ায় পাড়ায় তিনরকমের ইশতেহার বিলি করে। শহরের সর্বত্র এভাবে ক্লাব আক্রমণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ইশতেহার প্রাচীরে লাগানো হয়। সান্ধ্য আইন

ও পুলিশ টহলের মধ্যে পোস্টার লাগানোতেও সেদিন জীবন দেওয়া-নেওয়ার ঝুঁকি ছিল।

প্রীতিলতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সকলে দ্রুতবেগে রেললাইন পার হয়ে ধানক্ষেতের মধ্যে নেমে পড়ে। ইতিমধ্যে পুলিশের গাড়ির হেডলাইট পড়লে বিপ্লবীরা সবাই মাটিতে বসে পড়ে নিজেদের আড়ালে রাখে। তারপর শান্তি ও প্রফুল্লের হেফাজতে রাইফেলগুলি জমা দিয়ে, রিভলবার ও পিস্তল সঙ্গে রেখে মাস্টারদার শিবিরের উদ্দেশে বন্দর বা বটতলী গ্রামের দিকে বিপ্লবীরা অগ্রসর হয় এবং গিয়ে মাস্টারদাকে অ্যাকশনের বিবরণ দেয়। আক্রমণের সাফল্য সবাই উল্লসিত হলেও প্রীতিদির আত্মাহুতিতে আনন্দের মধ্যেও বেদনার ছাপ পড়ে। এর ভেতর থেকেই খবর নিয়ে জানা গেল যে সে-রাতে তেরোজন সাহেব ক্লাবঘরেই খতম হয়েছিল আর আহতদের সংখ্যা ছিল এগারো, তার মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আহত ও নিহতদের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থে ইউরোপীয় অ্যাসোসিয়েশন রিলিফ ফান্ড খুলেছিল। সরকারও শাস্তিমূলক কর বসিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল। এ-টাকাও রিলিফ তহবিলে যায়।

এইভাবে পাহাড়তলীর ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণের সার্থক পরিণতি ঘটে। জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ শাসকরা যে-হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, তার প্রতিশোধ নেওয়া হয়, আক্রমণের প্রথম প্রচেষ্টা সার্থক হয়, এতে দলকে হারাতে হয় আক্রমণকারী দলের নেত্রী প্রীতিলতাকে। প্রীতিলতা বাংলার অগ্নিযুগের প্রথম নারী শহীদ।

প্রীতি ওয়াদ্দেদার

কল্পনা দত্ত

পাহাড়তলী স্টেশনের কাছে পাহাড়তলী রেলওয়ে ক্লাব; প্রতি শনিবার সাহেব-মেমদের জমায়েত হয় সেখানে। খানাপিনা চলে, নাচবাজনা হয়, কিছুক্ষণ ফুর্তি করার পর যে যার ঘরে চলে যায়।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর ছিল এমনি এক শনিবার। রাত ৯টা হবে, হঠাৎ সমস্ত ফুর্তি কোলাহল থেমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে উঠল আর্তনাদ এবং বোমা ও গোলাগুলির শব্দ। সাহেব-মেম ইতস্তত ছুটোছুটি করে দরজা জানলা দিয়ে বেরিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে, আবার বাধা পেয়ে ছুটে আসছে ভেতরে।

মিনিট পনেরো পর দেখা গেল সব চুপচাপ– কেবল আহতদের গোঙানি আর নিহত ও আহতদের রক্তে ঘরের গোটা মেঝেতে রক্তস্রোত বইছে।

আটজন ছেলে হানা দেয় প্রীতি ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে, নির্বিঘ্নে সকলে পালিয়ে যায়, কিন্তু প্রীতি ফিরে গেল না, খেয়ে নিল পটাশিয়াম সায়নাইড।

ক্লাবঘরের দশগজ দূরে গিয়ে সে পড়ে গেল। একটি বোমার টুকরোয় তার বুকের জামাটাও রক্তাক্ত হয়ে আছে।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে অনেক ছেলে ফাঁসিতে গেছে, মরেছে, পুলিশের সাথে সংঘর্ষের কথাও শোনা গেছে অনেক। কিন্তু এই আন্দোলনে মেয়েদের স্থান ছিল না এতদিন, নেতারা তাঁদের বিশ্বাস করতেন না। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মেয়েরা কিছু কিছু এর ভেতর এলেও প্রত্যক্ষ কাজে মেয়েরা নেমেছে খুব কমই।

প্রীতি ওয়াদ্দেদারের মৃত্যুতে জনসাধারণ দেখল, মেয়েরাও এসব কাজে পিছিয়ে থাকে না। আত্মদানে ছেলেদের থেকে তারাও কিছু কম নয়। কাজের পন্থা নিয়ে সমালোচনা কেউ কেউ করলেও প্রীতি ওয়াদ্দেদারকে তাদের বীরকন্যা

বলে চট্টগ্রামের জনসাধারণ স্মরণ করে। প্রীতি ওয়াদ্দেদারের আত্মদানকে তারা শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়, বলে: ‘পুলিশের হাতে ধরা দেয়নি সে।’

আমি তখন জেলে– প্রীতি তার কাজে লিপ্ত হবার এক সপ্তাহ আগেই আমি ধরা পড়ে গেছি। পুলিশেরা ভেবে হয়রান হয়ে গেছে, পুরুষের বেশে পাহাড়তলীতে আমার যাওয়ার অর্থ কী হতে পারে। আমার গতিবিধি সম্বন্ধে সন্দেহ করলেও চার্জ করার মতো কিছু পায়নি।

২৫শে সেপ্টেম্বর জেলার গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর সহকারী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেই বললো: ‘বড় বাঁচান বাঁচিয়েছি আমরা তোমাকে।’ আবার কিছুক্ষণ পরে আরেকজন এসে বললো : ‘আমাদের বড় সৌভাগ্য আপনার মতো মেয়েকে আমরা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছি।’ অধৈর্য হয়ে উঠেছি। আসল কথা কেউ জানে না। কিছুক্ষণ পর ইন্সপেক্টর বললো: ‘কাল প্রীতি মারা গেছে, বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণ করার পর; এবার বুঝেছি তুমিও সেই পাহাড়তলী আক্রমণে যাচ্ছিলে– আমরা না ধরলে তোমার সেই একই অবস্থা হত। প্রীতিকেও ঠিক তোমার মতো পোশাকে পাওয়া গেছে।’ আরো অনেক কিছু সে বলে চলল।

আমার অত কথা শোনার মন ছিল না, শুনতে পারছিলাম না।

ঘরে চলে এলাম। প্রীতির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। যে চারজন মেয়ে আমরা এইদলে যোগ দিয়েছিলাম, তার মধ্যে দু’জন শেষ পর্যন্ত চলে গেছে, ছিলাম শুধু আমি ও প্রীতি।

আমরা ধরা পড়ার আগের দিন ১৬ই সেপ্টেম্বর রাতে খবর পেয়ে কাট্টলি গ্রামে গেছি। কথা ছিল, আমাকে ও প্রীতিকে দু’জনকেই একসঙ্গে কাজে পাঠাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে। খবর পেলেই বাড়ি থেকে যেন আমি একেবারে প্রস্তুত হয়ে চলে আসি। বাড়িতে আমাকে আর ফিরে যেতে হবে না। এর আগের বার যখন আসি, ফুটুদা আমায় একথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। ফুটুদাও একজন পলাতক নেতা।

তাই আমিও প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম। প্রীতি মাস দেড়েক আগে পলাতক হয়ে গেছে। পলাতক অবস্থায় তার সঙ্গে সেই প্রথম দেখা।

রাত্রে সমুদ্রের ধারে গিয়ে হলো টার্গেটিং শিক্ষা– তারপর দু’জনে মিলে কিছুক্ষণ গান করে চলে এলাম। ফুটুদা বললেন : ‘আমায় বাসায় ফিরে যেতে হবে, কাজ শুরু হতে আরো কিছুদিন সময় লাগবে– খোঁজখবর এখনও সব এসে

পৌঁছায়নি। বাসায় ফিরে যদি না যাই, ঘরের লোকও অস্থির হয়ে পড়বে। পুলিশের মধ্যে যখন জানাজানি হবে তখন থানাতল্লাসি বেড়ে যাবে, কাজেও বাধা আসতে পারে। আমার উপরে নিয়ন্ত্রণ আদেশ ছিল সরকারের।

প্রীতিও সঙ্গে সঙ্গে সায় দিতে লাগল। আমার দুঃখ রাখবার জায়গা আর রইল না। আমি জানতাম, নিশ্চয় আমি ধরা পড়ব এবার বাড়ি ফিরে গেলে। কিছুদিন ধরে ইন্সপেক্টরটি নিত্যই আনাগোনা করছিলেন আমাদের বাসায়। ঘরে গিয়ে আমায় না পেলে তো নিয়ন্ত্রণ আদেশ লঙ্ঘনের অপরাধেও জেল হবে আমার। আমি যেতে নারাজ। শেষ সিদ্ধান্ত হলো বাসায় গিয়ে যদি বুঝি অবস্থা খারাপ তবে চলে আসব, আর আমার সঙ্গে থাকবে রিভলবার। সত্যিই যদি ধরতে আসে। গুলি করে চলে আসব। প্রীতি আমাকে 'ছেলেমানুষি কোরো না' বলে বিদায় দিল।

প্রীতি আমার চেয়ে মাত্র দুই বছরের বড়। ওর মুখে ওই ধরনের কথা শুনে রাগ হলো, মনে হলো যেন কত বড় হয়ে গেছে সে।

১৭ই সেপ্টেম্বর সকালের দিকে বাসার কাছাকাছি যেতেই দেখি গোয়েন্দা বিভাগের লোক ঘরের বারান্দায়। তখনই ফিরে চলে আসি। রাত্রে প্রীতিদের আস্তানায় যাবার পথে ধরা পড়ি, ধরা পড়েই প্রীতির ওপরেই রাগ হলো আর অভিমান– ও আমার বন্ধু, ও জোর করলে হয়তো থাকতেও পারতাম, আজ ধরা পড়তে হত না।

সাতদিন পরেই প্রীতি মারা যায়। দিন সাতেক আগে যার সাথে কথা কাটাকাটি করে এসেছি, যার উপর এতদিন মনে অভিমান পোষণ করে এসেছি, সে নেই– এ কথা ভাবতে পারছিলাম না; আর ভাবছিলাম, আমি যদি প্রীতির কাছে থাকতাম, আত্মহত্যা করতে দিতাম না ওকে কিছুতেই।

মাস্টারদার মুখে শুনি প্রীতির আত্মহত্যার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের কাছে প্রমাণ করা যে মেয়েরাও দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে, দেশের জন্য তারাও লড়তে পারে।

কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, বেঁচে থেকে আরো অনেক বেশি কাজ সে করতে পারত।

প্রীতিকে জানি খুব ছোটবেলা থেকে, একই স্কুলে পড়ি দু'জনে। ও পড়ে এক ক্লাস উপরে, আমি পড়ি এক ক্লাস নিচে। পরিচয় হয় প্রথমে ব্যাডমিন্টন খেলার সাথী হিসেবে।

স্কুলের নিয়ম অনুসারে আমাদের ক্লাস ফাইভে উঠলেই ব্যাডমিন্টন খেলা ও লাইব্রেরির বই ব্যবহার করা ইত্যাদির অধিকার জন্মাত। কিন্তু অধিকার জন্মালেই হয় না। কোর্ট ছেড়ে দিতে হতো বড় মেয়েদের জন্য, সেই জন্য টিফিনের সময় দুপুর রোদে আমি খেলতে চাইতাম। অসময়ে খেলার সাথী হিসেবে পেতাম ওকে। ওর সাথে ঘনিষ্ঠতা এমনি করেই জমে উঠেছিল।

বড় ক্লাসে উঠে দু'জনেই 'গার্ল গাইড'-এ যোগ দিয়েছিলাম। আমরা বলতাম, আমাদের উচিত ওই ওদের অর্থাৎ ব্রিটিশদের ভালো জিনিস সব শিখে নেওয়া, আমাদের কাজে লাগবে। দু'জনে জল্পনাকল্পনা করতাম, আর ভাবতাম গাইডদের প্রতিজ্ঞাগুলো বদলে দিলে কেমন হয়! To be loyal to God and the King Emperor না বলে To be loyal to God and the Country হলে কেমন হয়!

গল্প প্রসঙ্গে ওর মুখে শুনতাম, ওদের বাড়িতে কেউ বিলিতি জিনিস ব্যবহার করে না, ওরা সকলেই স্বদেশি জিনিস ব্যবহার করে। ওর কাছে মনে মনে ছোট হয়ে যেতাম। আমাদের বাড়িতে কাপড়চোপড় থেকে আরম্ভ করে সবই বিলিতি।

গল্প করতাম আমরা অনেক কিছুই, কিন্তু আমাদের আদর্শ কী, কী করব না-করব সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের গড়ে ওঠেনি তখনও। কোনো সময়ে বা আমরা বড় বিজ্ঞানবিদ হয়ে যাব মনস্থ করেছি, কোনো সময় বা মনে করেছি ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ হব, কোনো সময় বা হয়ে উঠেছি ঘোরতর বিপ্লবী! বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো স্কলার হয়ে রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তি নেওয়ার পরিকল্পনা বহুবার হয়ে গেছে!

আবার প্রীতি তখন এ কথাও বলত, ও যদি ম্যাট্রিকে বৃত্তি না পায় তবে ওর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া চলবে না– খরচ বেশি। অথচ ওর খুব ইচ্ছে ছিল কলকাতায় পড়বে।

বৃত্তিও পায়নি, অঙ্কতে ও বিশেষ ভালো ছিল না বলে ফল খারাপ হয়ে যায়। ও চলে যায় ঢাকায়।

তারপরের বছর আমিও ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি। কলকাতায় আমি ছাত্রী সমিতিতে যোগ দিয়েছি– লাঠি, ছোরা ইত্যাদি শিখি। প্রীতি ঢাকায় দীপালি সঙ্ঘে যোগ দিয়েছে, আর শেখে লাঠি, ছোরা এইসব।

এই সময়েই চাটগাঁয়ে প্রীতি, আমি ও আরো দু'জন মেয়ে বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসি। প্রীতি ওই দু'জনকে বিশেষ বিশ্বাস করত না, যদিও স্কুলে ওরা ছিল ওর বন্ধু। বলত, ঠিক ওরা দল ছেড়ে চলে যাবে। ভীরুতাকে ও ঘৃণা করত।

একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে গোয়েন্দা বিভাগের একটি সার্কুলার বেরোয়। তার প্রতিবাদে সমস্ত স্কুল-কলেজ করবে ধর্মঘট।

আমরা ছুটিতে বাড়ি এসেছি, খাস্তগির স্কুলে পিকেটিং করলাম আমরা চারজন। এরপর থেকে স্কুলে বেড়াতে যাওয়া আমাদের বন্ধ হয়ে গেল। আমরা যেতে পারিনি, অন্য দু'জন ঠিক স্কুলে গিয়ে আবার পূর্ব প্রতিষ্ঠা ফিরিয়ে নিল। প্রীতি আমাকে বলেছিল, নিশ্চয় ওরা সুরমাদি মিনিদির কাছে ক্ষমা চেয়েছে। আমরা দোষ করিনি, মরলেও ক্ষমা চাইতে পারব না।

এরপরে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়ে গেছে। প্রীতি ইডেন কলেজ থেকে আই.এ. পাস করে বৃত্তি নিয়ে কলকাতায় বেথুন কলেজে চলে এলো। আমি বেথুন কলেজ থেকে 'ট্রান্সফার' নিয়ে চাটগাঁয় এসে পড়বার জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম এবং চাটগাঁতেই রয়ে গেলাম, ফলে প্রীতির আগেই মাস্টারদার সঙ্গে আমার দেখা ও যোগাযোগ হয়েছিল।

প্রীতির ছিল অসম্ভব আত্মবিশ্বাস, তাই সে ভাবতেও পারত না কেউ ওকে অবিশ্বাস করতে পারে।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস। আইএসসি পরীক্ষার কিছুদিন আগে কলকাতা যাই দলের কাজে। মার্চ মাসে পরীক্ষা– তাই ফেব্রুয়ারিতে কলকাতা যাওয়া স্বাভাবিক ঠেকেছিল, প্রীতি সন্দেহ করেছিল। শেষকালে দাদাদের নির্দেশ অনুযায়ী যখন আবার জিনিসপত্র নিয়ে অন্য একটি মেয়েকে নিয়ে আসি, ও মনে মনে অসম্ভব আহত হয়েছিল। আমারও কষ্ট হয়েছিল, আমিও জানতাম, প্রীতির মতো বিশ্বাসযোগ্য আর কেউ নেই। সেইবারেই মাস্টারদাকে প্রীতির সঙ্গে দেখা করবার জন্য অনুরোধ করি। সে আমাদের সকলের চাইতে ভালো, এই ছিল আমার ধারণা। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তার সঙ্গে মাস্টারদার প্রথম দেখা হয়– ও তখন বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে চাটগাঁয়ে চলে এসেছে।

প্রীতির কথা বলতে গিয়ে মাস্টারদা এক কথায় বলেছিলেন, 'অমন মেয়ে আর আমি দেখিনি।' দুটো জিনিসের এত সুন্দর সামঞ্জস্য আর কোথাও মেলে না।

ও যেমন ফুর্তিবাজ তেমনি ধীরস্থির আবার চিন্তাশীল। কোমলে কঠিনে মিলে ও অনন্য।

ওর জীবনেরই একটি ঘটনা। মাস্টারদাদের সঙ্গে ও দেখা করতে গেছে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ধলঘাটের এক গ্রামে। সন্ধ্যার সময় ক্যাপ্টেন ক্যামেরুনের নেতৃত্বে সৈন্যদল বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে। প্রস্তুত ছিল না ও একটুও, মেশিনগান চলল অপর পক্ষ থেকে, আমাদের পক্ষ থেকেও গুলি চলল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে হতভম্ব ভাব কেটে গেলে প্রীতিও গুলি চালাতে লাগল। ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন নিহত, নির্মলদা গুরুতরভাবে আহত, বাঁচবে না। ক্যাপ্টেন ক্যামেরুনের মৃত্যুতে সৈন্যরা যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, মাস্টারদার নির্দেশ এলো পালাবার চেষ্টা করতে হবে।

যে প্রীতি এতক্ষণ অন্যান্যদের মতো প্রাণপণে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল সে প্রীতি আহত নির্মলদার জন্য বিচলিত হয়ে পড়ল। আহত সাথী একজনকে কিছুতেই ছেড়ে যেতে সে পারবে না। অসম্ভব ভালোবাসত প্রীতি দলের প্রত্যেককে, নিজের প্রাণ ওর কাছে ছিল তুচ্ছ ব্যাপার। শেষকালে মাস্টারদা ওকে টেনে, বের করে নিয়ে আসেন। ঘটনাটা শুনে মনে হয়েছিল মাস্টারদার উক্তির সত্যতা। মনে হয়েছিল– হাতে আছে ওর আয়ুধ, আর বুকে আছে ওর অমৃত।

প্রীতি বিপদের সম্মুখীন হয়ে এতটুকুও ভয় পেত না। কিন্তু নিজের জন্য আর কাউকে অসুবিধায় ফেলতে সে সংকোচ বোধ করত।

এই ধলঘাটের ঘটনার পর সে পালিয়ে আসতে পারলেও সেই বাড়িতে তার কাপড়চোপড় পাওয়া যায়। কিন্তু শহরে নিজের বাসায় ফিরে এলেও পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেনি, সন্দেহ করতে পারেনি।

মাস্টারদা খবর পাঠালেন শহরে ওকে লুকিয়ে রাখতে হবে। বাসা থেকে ওর চলে আসার পর পুলিশের দৃষ্টি আমার উপর বেড়ে গেল। আমাদের বাড়িতে শাসনও আরো একটু কড়া হয়ে উঠল। তাই ও মনস্থ করল নিজের বাসায় চলে যাবে এবং বলল : 'কল্পনা, আমি চাই না আমার জন্য তুমিও গ্রেপ্তার হও, আমি অন্য ব্যবস্থা করব, এখন বাসায় চলে যাই।'

মাস্টারদা ওর জন্য পরে অন্য ব্যবস্থা করে তাকে নিয়ে যান। ৫ই জুলাই, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ, পুলিশ তাকে ধরতে গিয়ে দেখে সে পালিয়েছে। আমাদের বাসায় এসে গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর বলে : 'এত শান্তশিষ্ট নম্র মেয়ে ও,

এত সুন্দর করে কথা বলতে পারে, ভাবতেও পারি না তার ভেতর এত কিছু আছে। আমাদের খুব ফাঁকি দিয়ে সে পালিয়ে গেল।'

শুধু চাটগাঁয়ে এদের ফাঁকি দেওয়া নয়, কলকাতায় দিনের পর দিন মিথ্যা নামে ফাঁসির আসামি রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে প্রীতি দেখা করে এসেছে। কেউ তাকে চিনতেও পারেনি, ধরতেও পারেনি, বুঝতেও পারেনি। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ছিলেন চাটগাঁয়ের ছেলে, অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পলাতক আসামি, চাঁদপুরে তারিণী মুখার্জির হত্যার মামলায় প্রাণদ- দ-িত হন। কলকাতা সেন্ট্রাল জেলে তিনি থাকতেন। প্রীতি 'অমিতা দাস' নাম দিয়ে ৪০ বার 'ইন্টারভিউ' দিয়েছে তাঁর সঙ্গে, পুলিশের বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। শুধু পুলিশ নয়, বোর্ডিং-এ সুপারিন্টেন্ডেন্টও সন্দেহ করেনি কোনোদিন। ধলঘাটে রামকৃষ্ণদা সম্বন্ধে ওর লেখা একটি প্রবন্ধ পাওয়ার পর পুলিশ জানতে পারে।

রামকৃষ্ণদার ফাঁসি হওয়ার পর প্রীতি প্রত্যক্ষ কাজে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তারপরে হয় ওর মাস্টারদার সঙ্গে দেখা। ধলঘাটে চোখের সামনে নির্মলদার মৃত্যু ওকে আরো বিচলিত করে তোলে। মাস্টারদা বলেছিলেন, হয়তো আত্মহত্যা করবার সপক্ষে এত যুক্তি সে সেজন্যই দিয়েছিল। অত্যন্ত প্রিয় দু'জনের মৃত্যু ওকে আঘাত করেছিল খুব বেশি। মাস্টারদা বলতেন: 'আত্মহত্যা আমি একেবারেই সমর্থন করি না, কিন্তু যাওয়ার আগের মুহূর্তে তার যুক্তি দিয়ে সে আমার সমর্থন আদায় করে পটাশিয়াম সায়নাইড চেয়ে নিয়ে গেল। প্রীতির আগ্রহের কাছে আমার যুক্তি টিকল না।'

ছোট্ট একটি কথা, কিন্তু তাতেই প্রীতির স্নেহপ্রবণ ও দয়ালু মনের পরিচয় পাওয়া। ১৯০৩-এর পূজার বন্ধে ওদের বাড়িতে গিয়েছি। কথা হচ্ছিল, পাঁঠা কাটতে পারব কি না। আমি বলেছিলাম : 'নিশ্চয় পারব, আমার মোটেই ভয় করে না।' প্রীতি উত্তর দিয়েছিল : 'ভয়ের প্রশ্ন না, কিন্তু আমি পারব না নিরীহ একটি জীবকে হত্যা করতে।' একজন তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল : 'কী, দেশের স্বাধীনতার জন্যও তুমি অহিংস উপায়ে সংগ্রাম করতে চাও?' আমার মনে পড়ে প্রীতির স্পষ্ট জবাব : 'স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতেও পারব, প্রাণ নিতেও মোটেই মায়া হবে না। কিন্তু নিরীহ জীবন হত্যা করতে সত্যিই মায়া হয়, পারব না।' দু'বছরের মধ্যেই এর প্রমাণ অক্ষরে অক্ষরে সে দিয়ে গিয়েছে। পাহাড়তলী আক্রমণের নেতৃত্ব প্রীতিই নিয়েছিল, পটাশিয়াম সায়নাইড খেয়ে আত্মহত্যা করে প্রমাণও করে দিয়েছিল দেশের জন্য আত্মদান সে কত সহজেই করতে পারে।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন থেকে শুরু করে চাটগাঁয়ে সব আন্দোলনের সমস্ত খরচই দলের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকেই নেওয়া হত। প্রত্যেক কর্মীই তার সাধ্যমতো টাকা বাড়ি থেকে এনে দলের কাজে দিয়েছে। প্রীতির বাড়ির অবস্থা বরাবরই খারাপ ছিল। বাবা মিউনিসিপ্যালিটির কেরানি ছিলেন, সামান্য মাইনে যা পেতেন তাতে সংসার চালানোই কষ্টকর ছিল। প্রীতির উপরই সংসারের সমস্ত ভার ছিল। বাবা মাইনে পেয়েই ওর কাছে দিতেন। একদিন দুপুরে ওদের বাড়িতে বসেই টাকার সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। ৫০০ টাকা সেদিনই মাস্টারদার কাছে পাঠাতে হবে। ৪৫০ টাকা যোগাড় হয়েছে, আরো ৫০ টাকা চাই। ওকে টাকার কথা বলা হয়নি ওদের বাড়ির আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ বলে। আলোচনাকালে কাউকে কিছু না বলে সে উঠে গেল, পরমুহূর্তেই ৫০ টাকা এনে হাতে দিল। টাকা কোথায় পেল জিজ্ঞেস করাতে অম্লান বদনে সে বলল : 'কাল বাবা মাইনে পেয়েছেন, টাকা তো আমার কাছেই থাকে, সমস্ত টাকাটাই দিলাম।' প্রতিবাদ করা হলো দুটো কারণে। প্রথমত, সংসারে খরচ চালাবার আর কিছু রইল না, আর বাসায় বাবা যখন ফিরবেন তখন এই নিয়ে হইচই হবে, ওর উপর বাড়ির সবাই বিশ্বাস হারাবে। প্রীতি উত্তর দিল : 'সংসার চালাবার ভার আমার উপর। আমি বুঝব, তা নিয়ে আপনাদের মাথা ঘামাতে হবে না। আর বাড়িতে এই নিয়ে গোলমাল হবার কোনো আশংকাই নেই। আমার উপর বাবার বিশ্বাস কোনোদিনই ভাঙ্গবে না, তা ছাড়া আমি তো নিজেই বলব বাবাকে যে আমিই টাকাটা খরচ করেছি। আপনাদের ভয় নেই– বাবা জিজ্ঞাসাও করবেন না কিসে খরচ হলো। আমি টাকা খরচ করেছি শুনলেই বুঝবেন কোনো ভালো কাজেই খরচ হয়েছে এবং সে কাজ সংসার চালাবার চেয়েও মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ।' তবুও টাকা গ্রহণ করায় আপত্তি দেখেও প্রায় কেঁদে ফেলে বলল : 'গরিব দেখে আমাদের টাকা নিতে চান না। আমি যে নিষ্ঠাবান কর্মী হতে পারব তার প্রমাণ করার সুযোগও কি আমায় দেবেন না?' এই কথার পর টাকা নিতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে।

প্রীতি শুধু স্কুল কলেজে ভালো মেয়েই ছিল না, সে লিখতে পারত খুব ভালো, ভালো সাহিত্যিক ছিল সে। ইন্টারমিডিয়েটে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে মেয়েদের মধ্যে সে প্রথম হয়। পলাতক জীবনে সে যা লিখত সকলে তা আওড়াতো কথায় কথায়।

ছোটবেলা থেকে তার অদ্ভুত মেধাশক্তি দেখে ওর বাবা অবস্থাপন্ন না হলেও ওকে পড়িয়েছেন। প্রীতিও বলত, ওর বাবা বলেন : 'তোকে ঘিরেই রয়েছে

আমার ভবিষ্যৎ আশা ভরসা।' বাবার কথা বলতে গিয়ে প্রীতির চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠত। ওর বাবাকে ও খুবই ভালোবাসত।

প্রীতির বি.এ. পরীক্ষা দেওয়ার কিছু আগে ওর বাবার চাকরি যায়, ফলে প্রীতির আয়ের উপরই নির্ভর করে চলতে হতো সকলের। মা-বাবা, আর চারটি ভাই-বোন। সে নন্দনকানন হাইস্কুলে মাস্টারি করত, আর করত একটা টিউশনি।

কিন্তু দেশের কাজের জন্য ও সমস্ত তুচ্ছ করে চলে গিয়েছিল। একান্ত আপন যারা ছিল তাদের দুঃখকষ্ট, তাদের চোখের জলও তাকে পিছু টানতে পারেনি। দেশের হাজার হাজার মা-বাবার চোখের জল দূর করবার আদর্শকে সে গ্রহণ করেছে।

প্রীতির বাবা শোকে দুঃখে পাগলের মতো হয়ে গেলেন, কিন্তু প্রীতির মা গর্ব করে বলতেন : 'আমার মেয়ে দেশের কাজে প্রাণ দিয়েছে।' তাঁদের দুঃখের পরিসীমা ছিল না, তবু তিনি সে দুঃখকে দুঃখ মনে করেননি। ধাত্রীর কাজ নিয়ে তিনি সংসার চালিয়ে নিয়েছেন, আজও তাঁদের সেভাবে চলছে। প্রীতির বাবা প্রীতির দুঃখ ভুলতে পারেননি। আমাকে দেখলেই তাঁর প্রীতির কথা মনে পড়ে যায়, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। দুর্ভিক্ষের সময় মেয়েদের কাজ দেখতেন আর ভাবতেন, প্রীতি থাকলে এর চেয়ে বেশি কাজ হতো।

দেশের লোকও প্রীতিকে ভোলেনি, প্রীতির আত্মদানকে ভোলেনি। তাই জগদ্বন্ধু বাবু যখন রাস্তা দিয়ে যান, অপরিচিতের কাছে তাঁকে সবাই পরিচয় করিয়ে দেয়: 'প্রথমে যে মেয়ে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিল, উনি তারই বাবা।'

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

শেখ রফিক

১৯২৪ সালের কথা। দিনটির কথা কারো মনে নেই। খুব সম্ভবত জুলাই-আগস্ট মাসের কোনো একদিন। ভ্যাপসা গরম। আকাশে মেঘ জমেছে। যেকোনো সময় বৃষ্টি আসতে পারে। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে ভাই-বোনরা সবাই মিলে পড়তে বসেছে। রানী তখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। সবাই পড়ছে। শুধু থেমে আছে মধুসূদন। মধুসূদন প্রীতিলতার বড়দা। বড়দা'র পড়া না শুনতে পেয়ে তার দিকে তাকালো প্রীতিলতা। বড়দা মধুসূদন বোনের মুখের দিক তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলো– আজ রেল শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন দেয়ার জন্য বিপুল অংকের টাকা ব্রিটিশ কর্মচারীরা ঘোড়ার গাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছিল। ওই গাড়িতে দুজন পুলিশও ছিল। কিন্তু হঠাৎ দিনের বেলায় বড় রাস্তায় ধারে চারজন লোক পিস্তল হাতে সামনে দাঁড়িয়ে গাড়ি থামালো। তারা গাড়ি থেকে সবাইকে নামিয়ে দিয়ে টাকাসহ গাড়ি নিয়ে চম্পট।

পরে জানা গেল ওই লোকগুলো ডাকাত নয়, স্বদেশি। স্বদেশি আন্দোলনের কর্মী। তারা দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করছে। তারা মৃত্যুকে পরোয়া করে না। এই দুর্ধর্ষ ডাকাতির কথা সেদিন প্রীতিলতাকে দারুণভাবে আলোড়িত করে।

এক মাস পর, একদিন সেই রেলওয়ে ডাকাতির লোকদের আস্তানায় পুলিশ হামলা চালায়। উভয় দলের সাথে শুরু হয় সংঘর্ষ। দীর্ঘ সময় ধরে চলে বন্দুক যুদ্ধ। অবশেষে শোনা গেল সেই ডাকাত দলের দু'জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। আহত দু'জনের একজন হলো উমাতারা ইংরেজি বিদ্যালেয়ের শিক্ষক সূর্য সেন। অন্যজন পোস্ট অফিসের কেরানী অম্বিকা চক্রবর্তী।

গরুর গাড়িতে করে তাদের নিয়ে রহমতগঞ্জের রাস্তা দিয়ে জে. এম. সেন হলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন রানী তার এক সহপাঠিনীর বাসায় বসে জানালার ফাঁক দিয়ে তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখেছিল। সহপাঠিনীর যে ভাইটি উমাতারা স্কুলে পড়ে, সে বলে উঠলো ঐ-তো আমাদের মাস্টারমশাই, চাদর গায়ে বসে আছে। উনি আমাদের অংকের মাস্টার।

একথা শুনে সবাই অবাক হলো। তারা দু'জনছিল গুলিবিদ্ধ অবস্থায়। তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার সময়ও পুলিশ লাথি, চড় মারছিল। ক্লান্ত অবস্থায় দু'জনই গাড়ির মধ্যে বার বার ঢুলে পড়ছিল। এই দৃশ্য দেখে রানী খুব কষ্ট পেল। তাদের জন্য তার মায়া হলো। কিন্তু কি করার আছে তার! বাসায় গিয়ে মা-বাবাকে এই ঘটনা বলল। তারাও রানীর পূর্বেই এই ঘটনাটি শুনেছিলেন। রানী মা-বাবাকে বলেছিল চল আমরা মাস্টারমশাইকে দেখে আসি। বাবা সরকারি চাকরি করার কারণে রানীর অনুরোধ রাখতে পারলো না। একবুক কষ্ট নিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়া আর কোনো কিছুই করার ছিল না রানীর!

কিছুদিন পর শোনা গেল, কলকাতা থেকে বিখ্যাত ব্যারিস্টার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর পক্ষ সমর্থন করে চট্টগ্রাম এসেছেন। কোর্টে এই মামলা দেখার

জন্য অনেক লোকের ভিড় জমে। সূর্য সেনের অনেক প্রিয় ছাত্রও এই মামলা দেখার জন্য কোর্টে আসে। রানীর এক খুড়তুত ভাই রোজ এই মামলা দেখতে যেত। সেছিল চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র। তখন তিনি দশম শ্রেণির ছাত্র। খেতে খেতে ভাইটি সেই মামলার কাহিনী বলল। রানী বলল দাদা, তারা কবে ছাড়া পাবে? তাদের গায়ে নাকি গুলি লেগেছিল, কেমন আছে?

ভাইটি বলল দেখলামতো ভালোই আছে। রানীর মা বলল ডাকাতদের না ধরে ভালো মানুষকে ওরা মামলা দিয়েছে। রানী দেখিস তারা একদিন ছাড়া পেয়ে যাবে। মায়ের কথা শুনে রানীর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রানীর মা প্রতিভাদেবী ওই ছেলেটিকে মনু বলে ডাকত। তিনি বললেন মনু তারা যেদিন ছাড়া পাবে সেদিন বাসায় এসে আমাদের খবরটা জানিয়ে যেও। কিছুদিন পর তারা দু'জন বেকসুর খালাস পেল।

রানীর স্কুলের শিক্ষিকা উষাদি একদিন অন্যান্য মেয়েদের সাথে গল্প করার জন্য রানীকে ডেকে নিয়ে যায়। দেশ-বিদেশের গল্প শুনায়। ওই দিন তিনিই তার ছাত্রীদেরকে সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর মামলার কথা বলছিলেন। রানী সবার আগে বলে উঠল তাদের ছাড়া পাওয়ার কথা মা কয়েক দিন আগে বলেছিলেন।

উষাদি হেসে বললেন দোষ করেছে, মানে ডাকাতি করেছে। অপরাধ করেছে এই কথা তো? কিন্তু দোষ কার? কে শাস্তি দিবে? সেই বিচার কে করবে? এই যে আমাদের স্বদেশ, এখানে আমরা কিভাবে আছি কেন আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ না খেয়ে থাকে, শিক্ষা পায় না, রোগে ঔষধ পায় না, অবাক হয়ে তার কথা শুনতেছিলেন। ওই দিন উষাদি রানীকে একখানা বই 'ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই' দিয়ে বলেছিলেন এটা ভালো করে পড়। এটা পড়া শেষ হলে আরো বই পড়তে দেব। উষাদি ছিলেন স্বদেশীদের গোপন সহযোগী।

বাড়িতে ফিরে পরের দিন সন্ধ্যাবেলা ওই বইখানি পড়তে শুরু করলো। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে বইটি পড়ে শেষ করলো রানী। খুড়তুত ভাই ও উষাদি'র সংস্পর্শে এসে রানী রাজনীতির অনেক কিছু বুঝতে শিখলো।

স্কুলে রানীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন ছিলেন কল্পনা দত্ত (পরবর্তীতে বিপ্লবী)। এক ক্লাসের বড়রানী কল্পনার সাথে ব্যাডমিন্টন খেলতেন। তাদের স্বপ্নের কথা লিখেছেন কল্পনা দত্তঃ 'কোন কোন সময়আমরা স্বপ্ন দেখতাম বড়বিজ্ঞানী হব। সেই সময়েঝাঁসীর রানী আমাদের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে। নিজেদেরকে আমরা অকুতোভয় বিপ্লবী হিসেবে দেখা শুরু করলাম'।

একবার পুলিশ সূর্য সেনকে ধরার জন্য দেওয়ান বাজারে তার এক আত্মীয় বাড়ি ঘেরাও করে। সূর্য সেন পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে চট্টগ্রাম কলেজের মেধাবী ছাত্রের বাসায় উঠেন। এই মেধাবী ছাত্রটি শহরের ছাত্র-যুব বিপ্লবীচক্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। রানীর খুড়তুত ভাই। এই তরুণ বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনের পলাতক জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করলেন। চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের যেসব গোপন বই-পত্র ছিল তা রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল

এই তরুণ যুবকটির উপর। 'ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, কানাইলাল, দেশের কথা ও সরকারি রাউলাট কমিশন' ইত্যাদি বই।

'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স'-এ নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীরা ধরা পড়ার পর ওই ছেলেটি এই বইগুলো কাগজে মুড়িয়ে রানীর কাছে রাখে। রানীকে এই বইগুলো কাউকে দেখাতে নিষেধ করে দেয় এবং বলে এগুলো দেখালে অনেক বড় ক্ষতি হবে। রানী প্রতিজ্ঞা করে বলে, দাদা আমি এই বইগুলো লুকিয়ে রাখবো মা-বাবাকে দেখাবো না। রানী ততদিনে বেশ রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছে। রানী তখন থেকেই চিন্তা করতে থাকে এর মধ্যে এমন কি বই আছে যা কেউ দেখলে অনেক ক্ষতি হবে? দ্বিধা-সংকোচ-ভয় কাটিয়ে একদিন ভাবলেন দাদা বইগুলো অন্যদের দেখাতে নিষেধ করেছে কিন্তু আমাকে দেখতে বা পড়তে নিষেধ করেনি। তাই একদিন রাতে বাসার সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন ওই কাগজে মুড়ানো বইয়ের প্যাকেটটি খুলল। খুলে দেখে 'ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, কানাইলাল, দেশের কথা ও সরকারি রাউলাট কমিশন' ইত্যাদি বই। 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স'সহ আরো কিছু কাগজ-পত্র। রানী মাসখানেকের মধ্যে এই বইগুলো পড়ে প্রায় শেষ করে ফেলল।

২ মাস পর একদিন রানীর ভাইটি তাদের বাসায় আসলো। তখন বিকেল বেলা। সন্ধ্যা হতে হয়তো বড়জোর আধঘণ্টা বাকী। রানী বাড়ির পাশে আম গাছের নিচে বসে বাঘা যতীন বইটি পড়ছিল। ঘরে রানীকে না পেয়ে সে বাড়ির পাশে আম গাছের নিচে চলে গেল। সে আগে থেকেই জানতো রানী মাঝে মাঝে এই সময়টাতে ওই খানে গিয়ে বই পড়ে। চুপিচুপি রানীর পাশে গিয়ে সে দেখে বাঘা যতীন বইটি পড়ছে। প্রথমে কিছুটা ভয় পেয়ে গেল পূর্ণেন্দু দস্তিদার (রানীর খুড়তুত ভাই, চট্টগ্রাম কলেজের মেধাবী ছাত্র, ছাত্র-যুব বিপ্লবীচক্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক)। রানী একি করছিস? দাদা ভয় নেই, আমি কাউকে এই বই দেখাইনি। শুধু গোপনে গোপনে আমি পড়েছি। সন্ধ্যা নেমে আসতে আসতে দু'জন ঘরে চলে গেল। পূর্ণেন্দু দস্তিদার টেবিলের পাশে বসে রানীর ইতিহাসের বইটি উল্টাচ্ছিল। হঠাৎ বইয়ের পৃষ্ঠার মধ্য থেকে একটি ছবি পড়ে গেল। রানী ছবিটি উঠিয়ে দাদাকে দেখিয়ে বলে, নিশ্চয়ই তুমি এই ছবিটি চেন? 'ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই'। এই বইটি অনেক আগে পড়ে শেষ করেছি। আমিও সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঝাঁসির রানী, রানী ভবানীর মতো দেশের জন্য লড়বো। প্রয়োজনে এদের মতো জীবন উৎসর্গ করবো। তোমাদের সাথে যুক্ত হব। তাছাড়া তোমরা আমায় 'রানী' বলে ডাক। নাটোরের আর ঝাঁসির রানী যা পেরেছিল, চাটগাঁর রানী নিশ্চয়ই তা পারবে। দাদা অবাক হয়ে তার কথা শুনে গেল। কিছুই বলল না। কারণ দলের অনুমতি নেই। পরে কোনো একদিন পূর্ণেন্দু দস্তিদার এই কথাগুলো দলনেতা সূর্য সেনকে বলেছিল। মূলত: এই বইগুলো পড়ার পর রানী মনে মনে বিপ্লবী হয়ে উঠতে শুরু করেন। দেশের মুক্তির জন্য অগ্নি শপথ নেন। রানী থেকে বিপ্লবী প্রীতিলতার বিপ্লব জীবনের সূত্রপাত হয় এখানে।

প্রীতিলতার জন্ম **১৯১১** সালের ৫ মে। চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ধলঘাট গ্রামে। এখানে জন্ম হয়েছে অসংখ্য বিপ্লবীর। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে এই গ্রাম ছিল

বিপ্লবীদের প্রধান ঘাঁটি। প্রীতিলতার বাবার নাম জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দেদার। তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল অফিসের প্রধান কেরানী। জগদ্বন্ধু শৈশবে পিতার মৃত্যুর পর পৈত্রিক বাড়ি ডেঙ্গাপাড়া ত্যাগ করে মায়ের সাথে পটিয়া থানার ধলঘাট গ্রামে চলে আসেন। ধলঘাট ছিল তার মামা বাড়ি। এখানেই তিনি বড় হন এবং বসতি স্থাপন করেন।

মাতা প্রতিভাদেবী। তিনি ছিলেন গৃহিণী। জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দেদার ও প্রতিভাদেবী, তাদের পরিবারে ছয় সন্তানের জন্ম হয়। মধুসূদন, প্রীতিলতা, কনকলতা, শান্তিলতা, আশালতা ও সন্তোষ। জগদ্বন্ধু পরিবারের আদি পদবী ছিল দাশগুপ্ত। তাদের বংশের কোনো এক পূর্বপুরুষ নবাবী আমলে 'ওয়াহেদেদার' উপাধি পেয়েছিলেন। সেই ওয়াহেদেদার থেকে ওয়াদ্দেদার বা ওয়াদ্দার। মা প্রতিভাদেবী প্রীতিলতাকে আদর করে রানী নামে ডাকতেন।

প্রীতিলতার পড়াশুনার হাতেখড়ি বাবা, মায়ের কাছে। তার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। যে কারণে জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দেদার মেয়েকে (১ম ও ২য় শ্রেণিতে ভর্তি না করে) সরাসরি তৃতীয় শ্রেণিতে স্কুলে ভর্তি করে দেন। ডা. খাস্তগীর উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় ওই সময়ের অন্যতম নারী শিক্ষালয়। এই নামকরা স্কুলে প্রতিটি শ্রেণিতে তিনি প্রথম কিংবা দ্বিতীয় ছিলেন। ৮ম শ্রেণিতে প্রীতিলতা বৃত্তি পান।

ওই স্কুল থেকে ১৯২৭ সালে প্রীতিলতা প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাস করার পর ভর্তি হলেন ঢাকায় ইডেন কলেজে। থাকেন কলেজের ছাত্রীনিবাসে। তখন প্রীতিলতা বিপ্লবী লীলা নাগের সংস্পর্শে আসেন। তখন বিপ্লবী লীলা নাগের নেতৃত্বে 'দীপালী সংঘ' সংগঠনটি পরিচালিত হত। দীপালী সংঘ ছিল 'শ্রীসংঘ'-এর মহিলা শাখা সংগঠন। 'শ্রীসংঘ' ছিল তখনকার ঢাকার একটি বিপ্লবী দল।

অনেকদিন পর লীলা নাগের সাথে প্রীতিলতার দীপালী সংঘ নিয়ে কথা হলো। কথাবার্তার মাধ্যমে লীলা নাগ বুঝে নিলেন একে দিয়ে দেশের কাজ হবে। তাই লীলা নাগ প্রীতিলতা দীপালী সংঘের সদস্য হওয়ার জন্য একটি ফর্ম দিয়ে বলল, তুমি এর উদ্দেশ্য ও আদর্শের সাথে একমত পোষণ করলে বাড়ি থেকে এসে ফর্মটি পূরণ করে দিও।

বাড়ির আসার পরের দিন ওই ফর্মটি খুড়তুত ভাইকে দেখালো এবং বললো দাদা আমি এই সংঘের সাথে কাজ করবো। তোমরা তো আর আমাকে তোমাদের দলে নিবে না, তাই! এখানে যুক্ত হয়ে আমি দেশের জন্য কাজ করবো। ভাই পূর্ণেন্দু দস্তিদার ওই ফর্মটি প্রীতিলতার কাছ থেকে নিয়ে গেল আর বলল দলনেতাকে দেখিয়ে তোমাকে ফেরত দিব।

১৯২৯ সাল। তখন সূর্য সেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক। পূর্ণেন্দু দস্তিদার পরের দিন বিকেল বেলা বিপ্লবীদের গোপন বৈঠকে উপস্থিত হলো। বৈঠক শেষে জেলা কংগ্রেসের কার্যালয়ে তিনি মাস্টারদা সূর্য সেনকে ওই ফর্মটি দেখালেন এবং প্রীতিলতার মনের কথাগুলো বললেন। মাস্টারদা সূর্য সেন সবকিছু শুনে পূর্ণেন্দু দস্তিদারকে বললেন, আজ থেকে আমরা প্রীতিলতাকে আমাদের দলের সদস্য করে নিলাম। কিন্তু এই কথা

আপাতত আমরা তিনজন ছাড়া অন্য কাউকে জানানো যাবে না। প্রীতিলতাকে একদিন আমার কাছে নিয়ে এসো।

একদিন পত্রিকায় খবর হয়, 'চাঁদপুর স্টেশনের ইন্সপেক্টরের' হত্যাকারী দুই বাঙালি যুবক গ্রেপ্তার। তাদের নাম রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালিপদ চক্রবর্তী। প্রীতিলতার সঙ্গে রামকৃষ্ণের পরিচয় ছিল না। নিজেকে বোন পরিচয় দিয়ে জেলের ভেতর অসংখ্যবার রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করেন প্রীতিলতা। তার মুখেই শোনেন সূর্য সেনের দৃঢ়চরিত্র ও বীরত্বের কথা। দাদা রামকৃষ্ণের কাছেও প্রীতির একই প্রশ্ন, 'আমরা মেয়েরা কি তোমাদের মতো হতে পারি না, দাদা?'

প্রীতিলতা আই. এ. পরীক্ষা শেষ করে চট্টগ্রামে চলে আসেন। ওই সময়ও মাস্টারদা সূর্য সেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক। সূর্য সেনের সাথে প্রীতিলতার ভবিষ্যৎ কর্মকা-নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় প্রীতিলতার আই. এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। তিনি মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। মাসিক ২০ টাকা বৃত্তিও পাবেন তিনি। ঠিক হলো কলকাতার বেথুন কলেজে পড়াশুনা করবেন। ইংরেজি সাহিত্যে নিয়ে বি. এ. ভর্তি হলেন প্রীতিলতা। থাকেন ছাত্রীনিবাসে। এখানে মাস্টারদার নির্দেশে সাংগঠনিক কর্মকা-শুরু করলেন প্রীতিলতা। গড়ে তুললেন এক বিপ্লবী চক্র। এই বিপ্লবী চক্রে অনেক মেয়ে সদস্য যোগ দিলেন। তাদের মূল কাজই হলো অর্থ সংগ্রহ। অর্থ সংগ্রহ করে প্রীতিলতা চট্টগ্রামে পাঠাতে লাগলেন।

কলকাতার এক গোপন কারখানায় তখন তৈরি হয় বোমার খোল। মাস্টারদার নির্দেশ অনুযায়ী সে বোমার খোল সংগ্রহ করে প্রীতিলতা। ১৯২৯ সালে পূজার ছুটিতে প্রীতিলতা-কল্পনা দত্ত, সরোজিনী পাল, নলিনী পাল, কুমুদিনী রক্ষিতকে নিয়ে চট্টগ্রাম আসেন। বোমার খোলগুলো পৌঁছে দেন বিপ্লবীদের হাতে। মাস্টারদার নির্দেশ অনুযায়ী প্রীতিলতা এরপর থেকে প্রকাশ্য বিপ্লবী কাজেও যুক্ত হয়ে পড়েন। অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভারও তাকে তখন নিতে হয়। কলকাতায় যে বিপ্লবী চক্র গঠন করা হয়েছে, তাদের সকল প্রকার প্রশিক্ষণও প্রীতিলতাকে দিতে হতো।

বি.এ. শেষ বর্ষে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার দখল, জালালাবাদ সংঘর্ষ ও সেই যুদ্ধে তার আত্মীয় শহীদ হওয়ায় লেখাপড়ায় সে অমনোযোগী হয়ে ওঠে এবং রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির পর থেকে সে বি. এ. পরীক্ষা না দেয়ার জন্য মনস্থির করেন। কিন্তু তার শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে ডিসটিংশনে পাস করলেন।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের লৌহকঠিন দুঃশাসনের পাঁজর গুড়িয়ে দিয়েছে চট্টগ্রামের স্বাধীনতাকামীরা। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল মহানায়ক সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম দখল হলো। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চট্টগ্রামে ইংরেজ শাসন অচল হয়ে গেল। টেলিগ্রাফ-টেলিফোন বিকল। সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। রিজার্ভ পুলিশ ছত্রভঙ্গ। রেললাইন উপড়ে ফেলা হলো। স্বদেশী বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম শহর দখল করে ফেলেছে। এ সময় প্রীতিলতা কলকাতায়। চট্টগ্রামে আসার জন্য ব্যাকুল। সশস্ত্র বিপ্লবে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তখনো পর্যন্ত মাস্টারদার অনুমতি মেলেনি।

বি. এ. পরীক্ষা শেষে মাস্টারদার নির্দেশে স্থায়ীভাবে চট্টগ্রামে চলে আসেন। ১৯৩২ সালের শুরুতে বি. এ. পাস করার পর কর্মজীবনের শুরুতে চট্টগ্রাম অপর্ণাচরণ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হন। এ সময় বিপ্লবী কাজে আরো বেশি সক্রিয় হওয়ার তাগিদ দিল সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা সূর্য সেন।

১৯৩২ সালের মে মাসে প্রীতিলতার জন্মস্থান ধলঘাটে সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে মাস্টারদাসহ সহযোদ্ধাদের সঙ্গে গোপনে বৈঠক শুরু হয়। এই বৈঠক চলাকালীন সময়ে ব্রিটিশ সৈন্যদের সাথে বিপ্লবীদের বন্দুক যুদ্ধ শুরু হয়। সে যুদ্ধে প্রাণ দেন বিপ্লবী নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন। সূর্য সেন প্রীতিলতাকে নিয়ে বাড়ির পাশে ডোবার পানিতে ও গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকেন। সৈন্যরা চলে যাওয়ার পর মাস্টারদা বলেন, 'প্রীতি, তুমি বাড়ি ফিরে গিয়ে স্কুলের কাজে যোগ দেবে, তাহলে গত রাতের ঘটনায় কেউ তোমাকে সন্দেহ করবে না।' সাবিত্রী দেবীর বাড়িটি পুলিশ পুড়িয়ে দেয়।

এই ঘটনার পর ব্রিটিশ সরকার প্রীতিলতাকে সন্দেহ করা শুরু করে। মাস্টারদার নির্দেশে তিনি আত্মগোপনে চলে যান। অন্য একটি বিপ্লবী গ্রুপ ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণে ব্যর্থ হয়। যার কারণে মাস্টারদা প্রীতিলতাকে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে বলেন। এই জন্য কাট্টলি সমুদ্র সৈকতে বিপ্লবী দলকে মাস্টারদা সামরিক প্রশিক্ষণ দেন।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কাট্টলী গ্রামে এক গোপন বৈঠকে মাস্টারদার নির্দেশে প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্ত দেখা করতে রওনা হন পুরুষের বেশে। কিন্তু পথে পাহাড়তলীতে কল্পনা দত্ত ধরা পড়েন। প্রীতিলতা নিরাপদে নির্দিষ্ট গ্রামে এসে পৌঁছেন। এখানেই পরিকল্পনা নেয়া হয় প্রীতিলতার নেতৃত্বে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করার।

আক্রমণে প্রস্তুতি নেয়ার জন্য কাট্টলীর সাগরতীরে প্রীতিলতা ও তার সাথীদের অস্ত্র শিক্ষা শুরু হয়। প্রীতিলতার নেতৃত্বে যেসব বিপ্লবীকে ওই আক্রমণ পরিচালনার জন্য নির্বাচিত করা হয় তারা হলেন, ১. শান্তি চক্রবর্তী– দক্ষিণ কাট্টলী, ডবলমুড়িং থানা, ২. কালী দে– গোসাইলডাঙ্গা, ডবলমুড়িং থানা, ৩. সুশীল দে– ধৈরলা, বোয়ালখালী থানা, ৪. প্রফুল্ল দাশ– কাট্টলী, ডবলমুড়িং থানা, ৫. মহেন্দ্র চৌধুরী– মোহরা, পাঁচলাইশ থানা।

১৯৩২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর মাস্টারদা প্রীতিলতাকে বললেন, পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্ব তোমাকে নিতে হবে। প্রশিক্ষণ শেষে বীরকন্যা প্রীতিলতার নেতৃত্বে বিপ্লবীরা ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর রাত্রে পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করে সফল হন। আক্রমণ শেষে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার সময় তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। এ অবস্থায় ধরা পড়ার আগে সঙ্গে রাখা সায়নাইড বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। কারণ ধরা পড়লে বিপ্লবীদের অনেক গোপন তথ্য ব্রিটিশ পুলিশের মারের মুখে ফাঁস হয়ে যেতে পারে। প্রীতিলতা মারা যাওয়ার আগে মায়ের কাছে লিখেছিলেন, 'মাগো, অমন করে কেঁদোনা! আমি যে সত্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি, তুমি কি তাতে আনন্দ পাও না? কী করব মা? দেশ যে পরাধীন! দেশবাসী বিদেশির অত্যাচারে জর্জরিত! দেশমাতৃকা যে শৃঙ্খলভারে অবনতা, লাঞ্ছিতা, অবমানিতা!

তুমি কি সবই নীরবে সহ্য করবে মা? একটি সন্তানকেও কি তুমি মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতে পারবে না? তুমি কি কেবলই কাঁদবে?’

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ব্রিটিশদের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করার জন্য নিজেকে গড়ে তোলার পাশাপাশি অসংখ্য বিপ্লবীদের প্রশিক্ষিত, অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করে গেছেন। নিজেদের বিপ্লবী কর্মকা-ের পরিকল্পনা ধরা পড়ার পর যেন কেউ জানতে না পারে তাই স্বজ্ঞানে নিজেকে দেশমাতৃকার জন্য আকুণ্ঠভাবে উৎসর্গ করলেন। দেশের জন্য এই আত্মদান আজও মানুষকে উদ্বেলিত করে, শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার সাহস যোগায়।

ভারত উপমহাদেশের অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা থেকেই অনেক নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি বিপ্লবী দলের সঙ্গে ঘরে ঘরে মা, বোন, মাসিমা, কাকিমা, দিদি, বৌদিরা যুক্ত ছিলেন। যেমন ছিলেন অগ্নিযুগের প্রথম পর্বে স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, আশালতা সেন, সরোজিনী নাইডু, ননী বালা, দুকড়ি বালা, পরবর্তীকালে ইন্দুমতি দেবী, (অনন্ত সিংহের দিদি) লীলা রায়, পটিয়া ধলঘাটের সাবিত্রী দেবী প্রমুখ দেশপ্রেমিক নারী। তারই ধারাবাহিকতায় সেই অগ্নিযুগের অগ্নিকন্যা, বীর কন্যা প্রীতিলতার আবির্ভাব।

‘প্রীতিলতার আত্মকথা’ বইটির লেখা ও তথ্য

নিচের বইগুলো থেকে সংগৃহীত

১. সূর্য সেনের সোনালি স্বপ্ন, রূপময় পাল

২. অগ্নিযুগের স্বাধীনতা সংগ্রাম, রূপময় পাল

৩. বীরকন্যা প্রীতিলতা, সম্পা : পংকজ চক্রবর্তী

৪. সর্বাধিনায়ক মাস্টারদা সূর্য সেন, চিন্ময় চৌধুরী

৫. ইতিহাসের পাতা থেকে, আশিসকুমার মুখোপাধ্যায়

৬. কারাস্মৃতি, কুন্দপ্রভা সেনগুপ্তা

৭. চট্টগ্রাম আক্রমণকারীদের স্মৃতিকথা, কল্পনা দত্ত (যোশী)

৮. প্রীতিলতা, অমলেন্দু বিশ্বাস

৯. বীরকন্যা প্রীতিলতা, পূর্ণেন্দু দস্তিদার

১০. স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম, পূর্ণেন্দু দস্তিদার

১১. সম্রাট বনাম সূর্য সেনের ঐতিহাসিক মামলার রায়, অনুবাদ : আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া

১২. মাস্টারদা সূর্য সেন ও সূর্য সাথীরা, জামাল উদ্দিন

১৩. পূর্ণেন্দু `w¯Í`vi, মফিদুল হক

১৪. অগ্নিযুগের অগ্নিদিন ১৮ই এপ্রিল, সম্পা : ম. আ. আউয়াল

১৫. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ও বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন, সম্পা : শরীফ শমশির

১৬. বিদ্রোহী ভারত, নীহাররঞ্জন গুপ্ত

১৭. ওরা আকাশে জাগাতো ঝড়, শৈলেশ দে

১৮. স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালি বীরাঙ্গনা, সফিউন্নিসা

১৯. অগ্নিযুগের চট্টগ্রাম ও আন্দামান, কালীপদ চক্রবর্তী

২০. শত বিপ্লবীর কথা, সম্পা : শেখ রফিক

২১. অগ্নিযুগ, সম্পা : শৈলেশ দে